প্রথম প্রকাশ ঃ ২৫শে বৈশাখ, ১৯৬০

প্রকাশক ঃ প্রবীর জানা
পোষ্টাল পার্ক (রায়নগর)
পোঃ বাঁশদ্রোণী, কলিকাতা-৭০০০ ৭০

মুদ্রাকর ঃ নির্মলকৃষ্ণ পাল
নির্মল মুদ্রণ
৮ ব্রজদুলাল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০ ০৬

হাজার হাজার অসহায় মানুষগুলোর

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

মুখবন্ধ

পনেরজন কবির লেখা নিয়ে 'প্রতিভাস' বিভিন্ন সময়ে ছোট-বড় পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিশেষ কবিতা সংকলন যার পরিচয় কাব্যগ্রন্থের শেষে উল্লেখিত কবি-পরিচিতি বহন করছে। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত এই সংকলিত কবিতা লেখক/লেখিকাদের স্বেচ্ছা নির্বাচন। কবিতার সময়, কবিতার মুহূর্ত—এই কথা মনে রেখে ছড়া-গাথা, সূক্তিমালা, লিমেরিক থেকে শুরু করে সনেট, ছন্দোবদ্ধ, মুক্তছন্দ, হাল্কা, ব্যঙ্গরসাত্মক এবং ভাবগম্ভীর সব রকম কবিতাই লেখকের মতবাদ নির্বিশেষে স্থান পেয়েছে—বিচারের ভার অবশ্যই পাঠকের 'পরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি বিদগ্ধ পণ্ডিত কবি সাহিত্যিক ও সমালোচক বার্ণিক রায় তাঁর তিনটি কবিতা 'প্রতিভাস' সংকলনে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করেছেন।

কলকাতা ও মফঃস্বল বাংলায় ক্ষুদে পত্রিকার আবির্ভাব আমাদের সাহিত্য-জগৎ তথা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। শারদীয় অবকাশে বড়ো বড়ো নামীদামী পত্রিকার পাশাপাশি বৈচিত্রময় এইসব পত্রিকার সমাবেশ দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। পৃথিবীর কোথাও একই সময়ে এই ধরনের সাহিত্য-বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় কিনা সন্দেহ। প্রাথমিক পর্বে এইসব পত্রিকা অবলম্বন করে অনেকেই সাহিত্য জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন—তার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নয়। সাহিত্য-বিচারে এইসব পত্রিকাও যে প্রণিধানযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মূল্যায়নই তার অকাট্য প্রমাণ।

কিন্তু এইসব পত্রিকা প্রকাশ করার সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আর্থিক দীনতা। এ ব্যাপারে প্রকাশনা সংস্থাও এগিয়ে আসে না, তাদের অর্থকরী মনোবৃত্তির দরুণ। আর সরকার বাহাদুরও নির্লিপ্ত। তাই সীমিত প্রচেষ্টায় দরাজ হস্তে কিছু উৎসাহী সাহিত্য প্রেমিককেই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হয়। পত্রিকা-প্রকাশ করার নেপথ্যে তাদের করুণ কাহিনী কুলুকুলু রবে গুমরে উঠে দুকূল ছাপিয়ে পড়ার আগেই ফল্গু নদীর মতো উষরভূমিতে লীন হয়ে যায়। দুঃখের কথা পাঠকেরা তার কোন খবরই রাখেন না।

বর্তমান বাংলায় সঙ্গীত, সাহিত্য, ভাস্কর্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি সর্বত্র একটা বন্ধ্যাত্বের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। দেশের সর্বস্তরে অধোগতি সম্ভবত এই বন্ধ্যাত্বের কারণ। তাই সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথপুষ্ট বাংলার সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

সুনীল পাল

সূচীপত্র

সুন্দরবনের এলিজি

আঁধার হৃদয়ে বনের হরিণী একা ঘাস খায়—জলে মুখ দেয় ; উন্দাম বাতাস
সঙ্গে করে কোথা থেকে এক চিতা এসে অরণ্যের ছায়া তোলপাড় করে,
হরিণীকে মুখে করে নিয়ে গেলো বনের ভেতরে ; আরেক শিকারী তখন
সেখানে গোলা-ভরতি বন্দুক হাতে নরম মাংসের লোভে ঘুরছিলো—
দেখলো রক্তের ধারা কালো মাটি আলো করে আছে ; আরো কিছু দূরে
গিয়ে ছিন্ন টুকরো দেহ দেখতে পায় হরিণীর—দেহহীন চোখ ভীষণ
করুণ তাড়া করে—চারপাশে রক্ত কঠিন জমাট, শিকারী দুহাত ধুয়ে
একটা টিলায় বসে জল খাবে বলে····
এমন সময় মৃত চোখ থেকে অজস্র হরিণী বের হয়ে শিকারীকে ঘিরে ফেলে ·
কাকে ছেড়ে কাকে ধরবে ঠিক করতে পারে না।
হরিণীর নরম শরীর মেরেছিলো চিতা ? চিতার লোভের লালে হরিণীর
চোখে হঠাৎ নেচে উঠেছিলো কামনার আদিম রঙিন···চিতার রক্তের মধ্যে
মিশে গেছে কখন সে····এই চিতা তারি গোপন হৃদয়····রাত্রি এলে
শিকারী নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে হরিণীর রক্তে-মেশা চিতার গর্জন শুনতে শুনতে
··· দূরের আকাশে নক্ষত্রেরা গতিপথে ঠিকমতো চলে।
হরিণীর জন্যে আমারও হৃদয় ছিঁড়ে গেছে শীতের হলুদ শুকনো পাতার
শব্দে, কালো ভেজা মাটি, আদিম তৃণের গন্ধে রোমাঞ্চিত····

২

বহু বহুকাল আগে, কোনো এক আদিম রুপোলি ভোরে···হঠাৎ কোথাও
পাখির ডাকের মতো আমার আত্মাকে ঘুম থেকে ঘুমের ভেতরে চমকে
জাগিয়ে দিয়ে কোনো এক রমণীয় জলবতী পদ্মগানের সুরের আলো মেখে
মিলিয়ে হারিয়ে গেলো বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের বাতাসে।
সন্ধ্যা এলে নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি দূরের মায়াবী আলো
কখন সুন্দরবনে ঢুকে একটা বাঘিনী বীভৎস রোমশ গন্ধের মতো
সবুজ পাথর ছায়া মেলে আমাকে দেখছে আমার রক্তের স্বাদ নেবে বলে···

অসীম সাহসে কৌতূহলে দুচোখ ফিরিয়ে গভীর মাটির নীচে দেখি টুকরো ছেঁড়া-খোঁড়া-ছিন্ন শরীর হৃদয় ধরণীর রোমকূপে মিশে আছে—বিপুল আনন্দে হেঁটে বেড়ায় বাঘিনী ; কখনো আবার আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারিনা …গভীর রাত্তিরে এক দেবকান্ত বাঘ তার সঙ্গে সহসা মিলিত হয়—ঝড় ক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগর ফুঁসে ওঠে ; বালাসোর তমলুক ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে প্রমত্তের হাসি হাসে… সে জলের স্রোতে আমিও তলিয়ে থাকি…রময়িতা লোলা এক রক্ত পদ্ম দোলে হাসে…

৩

ঘুমনো ব্যথার পদ্মের ঢেউ দিয়েছো বেদনার আলো ফেলে ; কালো জল ঝিকমিক করে, এর গন্ধে বিবশ হৃদয় ক্লান্ত…কোনো শব্দ ভাষা কথা নেই…পদ্মের পাপড়ি যেন কথা মেলে আকাশে উড়তে চায় অরণ্যের অন্ধকারে।
চারদিকে বন, ভিজে মাটি, শুকনো হলুদ পাতা, উত্তরের হাওয়া, নদীতে ঢেউ, গাছে গাছে পাতার আদিম ছায়া, নিবিড় অরণ্যে রক্তাভ নিঃশ্বাস ভুবন কাঁপিয়ে দেয়, একটা চন্দনা ছোট মগডালে বসে গাইছিলো আপন সবুজ মনে ; ডোরা-কাটা তীক্ষ্নদন্তী একটা বাঘ দূরে থেকে এসে হঠাৎ লাফিয়ে মুখে করে তাকে নিয়ে অন্ধকার অরণ্যে পালালো…চোখে শুধু সমুদ্রের ঢেউ ভাঙে…কোন দূরে

দ্বীপে আঘাতে আছড়ে পড়ে…মেঘ…অশ্রু…বাসন্তীর ঝিম লাগা বনের কিনারে বিদ্যাধরী তীরে একটা কুমির হরিণীকে ঠ্যাঙ ধরে নিয়ে গেলো কালো জল…ওপরে পদ্মের নীল আকাশ আকাশ আকাশ হয়ে আছে…স্থির, শান্ত…

এইসব চন্দনার মত হৃদয়ের ছায়া বনের পাতায় আঁধারের হৃদয়ের গান হয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় গন্ধে ভাসে ; তারি সঙ্গে মিশে থাকে বাঘের রোমশ গর্জনের লোলুপ উন্মত্ত উল্লম্ফন ; শীতের নদীর দুই তীরে পউষের কুয়াশা…জল কাঁপে রোদে…

এদের কুয়াশা বুকে নিয়ে, ব্যথার রহস্যে জেগে আঁধারে ঘুমুতে গিয়ে ঘুম ভেঙে শুনি ট্রেনের হুইসেলে দূরে যাত্রা…যাত্রাপথে বাতাসের হাওয়া…

ভীষণ প্রদাহ পৃথিবীর বুকে

একরাশ বরফের 'পরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে
আমি ঘেমে যাচ্ছি,
জ্বলন্ত ফার্নেস 'পরে বসে বসে হিমাঙ্কের মত
আমি জমে যাচ্ছি
রক্তবর্ণ তান্ত্রিকের উদ্ধত উলঙ্গ চিমটার
সদা ঝনঝনি
ফলাহারী বাবার প্রশস্ত বুকে কুমারী নারীর
স্তন দুগ্ধবতী
স্বর্গজয়ে সুনিশ্চিত মহাশূন্যে ঘোরতর নক্ষত্র
যুদ্ধের মহড়া
শান্তির পায়রা আকাশে ছেড়ে দিয়ে তবু অগ্নি
স্বার্থক পরীক্ষা
সরোবরে মাছ ছেড়ে চতুর জেলের মত সময়ে
তাহার নিধন
বিগবেন-হাতছানি ক্রেমলিনে ঢং ঢং
ঘণ্টা বাজে তারি
আসন্ন ভূকম্পের অশনি-সংকেত বোঝে না।
ভূতত্ত্ববিদরা
অঙ্গুলীমালেরা নড়ে চড়ে প্রাণপণ ওঠে শুধু
তবু দিশেহারা
বর্ণবিষ উগরায় থরে থরে কাল সাপ
সম্মুখে সবার
পিঁপড়ের মত থাকে প্রাচ্যের ব্রিটেন নাকি
ক্লেশোঁবতী বাণী
আকাশ গুরু গরজায় অগ্নিগর্ভ পাতালের
উথালি পাথালি
ভীষণ প্রদাহ পৃথিবীর বুকে চুঁয়ে চুঁয়ে
শুধু রক্ত বমি।

একটা দিশারী আমার মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়

একটা দিশারী আমার মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
একটা তরঙ্গ হৃদয়ের গভীর নিঃশ্বাসে

বল্মিক-কঙ্কাল অঘোরে ঘুমোয়
পেতিনীরা নাচে ঘিরে তা-থৈ তা-থৈ
শবাসনে কাপালিক রক্তবর্ণ চোখ
সামনে অবুঝ শিশু অপেক্ষা বলির
একটা দিশারী আমার মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
একটা তরঙ্গ হৃদয়ের গভীর নিঃশ্বাসে

মুক্ত সে-শিশু আজ কাপালিক-পাশ
বিহ্বল সন্ত্রস্ত মন করে ছুটোছুটি
হাড়িকাঠে ছেদমুণ্ড ভয়ানক স্মৃতি
কৌণিক বিন্দু থেকে বৃত্ত আঁকে মনে
একটা দিশারী আমার মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
একটা তরঙ্গ হৃদয়ের গভীর নিঃশ্বাসে

বুড়িমার্গা দাইগিরি ছেড়ে দেছে কবে
জারজ সন্তান সব পৃথিবীর বুকে
নাভিশ্বাস পৃথ্বী-ঢেউ শোনে স্পুট্‌নিক
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যুগ্ম-বিজয়িনী
একটা দিশারী আমার মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
একটা তরঙ্গ হৃদয়ের গভীর নিঃশ্বাসে।

পেরেস্ত্রৈকা

পিটারের মতো হতে চাও তুমি কমরেড গরবাচভ !
শুনি লেনিনের সমকক্ষ তুমি জনতার মুখে মুখে !
সাধ্য কি গ্রোমিকোর মতো কিছু আপদ তোমার গতিরোধ করে
গোটা ক্রেমলিন যখন মুঠোয় তোমার !
মস্কোর পথে পথে এখন তোমার বিশাল প্রতিকৃতি
পাদপদ্মে স্বহস্তে তোমার লেখা গ্লাসনস্ত আর পেরেস্ত্রৈকা।

লক্ষ কোটি মানুষের কবর রেখে গেছে জোসেফ স্তালিন।
থাকলে তুমি নিশ্চয় ফাঁসি হতো তার মৃত্যুর ঠিক পর পরই!
শুধু হিটলার অজুহাতে বেঁচে গেছে ব্যাটা মহাযুদ্ধের ডামাডোলে!
কমরেড খ্রুশ্চেভ ঠিকই তাকে টেনে ছুঁড়ে ফেলেছেন
সোভিয়েত বিস্মৃতির ওই নোংরা বেনোজলে—
যদিবা ক্যারেবিয়ান জলে তিনি হাবুডুবু খেয়েছেন
হলিউডি কেনেডির টেরি-চুল ভয়ে!

জাতি-সত্তা পায়নি সমাধান অমানুষ ওই লোহারীর হাতে;
যুগ যুগ ধরে তাকে রেখেছিল শুধু স্তব্ধ করে কলোসাসী বুটের তলায়!
তাই আজারবাইজান আর জর্জিয়ায় হরদম গোলাগুলি চলে;
তাই রক্তে ভেজা কোরানের পাতা দেখে কেঁদে উঠে তোমার পরাণ;
মৌলবাদী লোমশ শরীরে কোন মতে ক্ষুর চালানো যাবে না বলে!

লোহার পাঁচিল তুলে রেখেছিল গোটা সোভিয়েত জুড়ে ওই মহাজেদী!
তাই কুকর্ম তার জানেনি কেউ গোটা পৃথিবীর লোকে!
কিয়েকের্গার্ড শিষ্য তুমি কোঁতিয় আদলে
গুঁড়িয়ে দিয়েছ সে-দেওয়াল অবলীলাক্রমে।
পাস্তুরনায়েক, সোলজেনিৎসিন, শাখারভের দল পিতৃভূমি ছেড়ে যায়—
ধুরন্ধর প্রতিভার গতিরোধ করবে তুমি আশ্বাস দিয়েছ ক্রেমলিনে!

বুর্জোয়া সংস্কৃতি লোহার গরাদে রেখে দিয়েছিল নির্দয় ওই গোঁফো মহাপাজী!
বন্যার স্রোতের মতো তুমি তাকে দিয়েছ ঠাঁই প্রতি ঘরে ঘরে—
স্ট্যানিস্লাভস্কি আইজ্যানস্টাইনের দেশ এখন
পুবে দেশী কাপুরের চ্যাংড়া কচিকাঁচাদের হাতে!
তাদের ডিস্কো নাচ আর নকল নবিশী সাইবেরিয়া থেকে দূর কাম্পিয়ান!
বুর্জোয়া সমাজ খারাপ হলেও তার কালচারটা নেহাত মন্দ না!
তাই রাতারাতি সহস্র নামকরণ রাতারাতি মূর্তি বসানোর ধুম;
লক্ষ লক্ষ সাম্যবাদী কচুকাটা হয় যদি তোমার কি করার আছে—
কোন ব্যাটা ঘোর মাওবাদী আর কেউবা কট্টর ট্রটস্কী প্রত্যয়ী!

হার্মাদ নারীদের নাচ বন্ধ ছিল সর্বক্ষণ জোসেফের রক্তচক্ষু ভয়ে
নাচতে নাচতে এখন কাঁচুলিসহ তারা প্যান্টি খুলে ফেলে!

সঙ্গে সঙ্গে অডিটোরিয়াম থেকে ফেটে পড়া চিৎকার—
স্বাধীনতা চাই আরো স্বাধীনতা !
কুমারী নারীর যৌন-সুখ ছিল না ওই হারামির যুগে ;
গোটা ইউরোপীয় ধাঁচে তুমি তারে ফিরিয়ে এনেছ ওই রুশ দেশে !
লিবিডোর দল তাই পাগলের মতো তব করে জয়গান—
এ্যাদ লিবিতাম্ এ্যাদ লিবিতাম !
ইসকন রথ টেনে ধন্য এখন রুশ-দূতোবাস-মুনি,
মিশনের খুদকুঁড়ো চালডাল খিচুরীর স্বাদে
চেটেপুটে খায় এখন পুরুষ্টু তাদের ছেলেমেয়ে !
মনে পড়ে প্রফুমো-কিলার গুপ্ত আয়ুবীয় হাওয়া
লেগেছিল লণ্ডনের সেই রুশ-দূতোবাসে,
সে-হাওয়া এখন কলকাতা-রুশ-অন্তঃপুরে
ফ্রিস্কুল স্ট্রিট ছেয়ে যাবে রুশী পদব্রজে
পেণ্টাগনী মহাভেরী নাবিকদের পরিবর্তে।

নিথর যৌবন ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে

নিথর যৌবন ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
হঠাৎ আমি এ কোথায় এলাম
প্রভাত সূর্য্যের হাল্কা মসৃণ কিরণ
রাঙ্গা হতে হতে হঠাৎ উদ্ধত হলুদ মধ্যাহ্নে
রক্তিম আভায় পশ্চিম দিগন্তে মিশে গেল
কী অসহ্য প্রদাহ পৃথিবীর বুকে
কী মর্মান্তিক বিকিরণ ক্রিয়া
হিরোসিমা নাগাসাকি থেকে পঞ্চাশ মেগাটন
যুদ্ধবাজ উন্মত্ততা বাজায় দামামা
শান্তি সেনা চলে গুটি গুটি পায়
ভোরের ভৈরবী আনে দুরন্ত মল্লার
গৈইয়ার বেয়োনেট জিহ্বা লকলক
পিকাসোর ঘোড়াদের কাতর যন্ত্রণা
মুষ্টিবদ্ধ হাত তোলে বিধ্বস্ত গোয়েনিকা।

দীপ তুমি একদিন

দীপ তুমি একদিন নিভে যাবে জানি
নেভার আগে তবু শুধু বলে যেও
আজীবন দীপ্তিময় আলো জেৱলে গেছি
তমস আঁধারে নিজেকে করিনি সমর্পণ
প্রাণপণ প্রচেষ্টার কষ্টি পাথরে
প্রাণঢালা সবার ভালবাসা পেয়েছি।

তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ছিল জন্মলগ্ন থেকে
টুঁটি টিপে মেরে ফেলার ফন্দি এটেছিল সবাই
গ্রানাইট পাথরের মত ছিল বুকে অটল বিশ্বাস
আর ব্লিজার্ডের সচকিত ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মন
জায়গা তবু কোন মতে ছাড়োনি এক ইঞ্চি।

বাম হাতে ভরপুর মুক্তিগান ছিল একতারা
আর এগিয়ে চলার স্পর্ধিত দুর্বার গতি
উচ্চ নীচ ভেদাভেদ কোথা তার স্থান
সব জাতি সব প্রাণ উদ্বেলিত মানব-সাগর
বুকে তার ধ্রুবজ্যোতি আঁকে প্রতিচ্ছবি।

তবু নিজের মুক্তিতে তুমি থাকোনি বিভোর
ব্যথীর বেদন বোঝার ছিল ক্ষমতা অসীম
কোটি কোটি সন্তানেরে যুগ-সন্ধিক্ষণে দিয়ে বলি
ভগীরথী মুক্তি-গঙ্গা বয়ে এনেছিলে
অভিশপ্ত সগর বংশের উদ্ধার মানসে।

তবু রঘু-বংশ ধ্বংস হয় অগ্নিবর্ণ কামুক নিশান
তবু যদু-বংশ ধ্বংস হয় ভগবান কৃষ্ণের সম্মুখে
তবু ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্ট রোম-রাজ-ভ্রূকুটি নির্দেশে
তবু পুণ্যভূমি কারবালা অবিরত রক্তস্নাত
ওই মহাপাপী এজিদের কলুষ নিষ্ঠুর হাতে।

দীপ তুমি বুজে যাবে একদিন জানি
বোজার আগে তবু শুধু বলে যেও

আমরণ আলোকিত দীপ্ত ঢেলে গেছি
গোলক ধাঁধার সর্পিল পথ কেটে কেটে
স্পন্দিত স্ফটিক স্বচ্ছ লক্ষ কোটি তারার জগতে
সূর্য্যদীপ্ত মুখে আমি মহাকাশ স্পর্শ করেছি।

শর-শয্যা

আমি ভীষ্ম তীরে তীরে বিদ্ধ সারা দেহ
নিয়ত-বিধান ব্যাসের অলংঘ্য লেখনী
আর চতুর কৃষ্ণের চতুরালি
সামনে শিখণ্ডী পেছনে গাণ্ডীব-অর্জুন
পরশুরাম শিষ্য আমি—শুধু অসহায়।

কলহের বীজ পুঁতে গেছে রাষ্ট্রপিতা
মোহন গান্ধী আর মহম্মদ জিন্না
সহযোগী জহর বল্লভ গোবিন্দ
আর সুরাবর্দি, সওকত যত
দুই শিবিরের সারিবদ্ধ সৈনিক মুখোমুখি সবার সম্মুখে।

ভরত-বংশী ধারা মানেনিকো তারা
রাষ্ট্রের চাইতে উচ্চ বংশ-পরিচয়
হয়েছিল অতি প্রিয় তাদের কাছে
ভেদ-রেখা মুখ্য গৌণ দিয়ে জলাঞ্জলি
সফেদ শক্তির কাছে নির্লজ্জ কুর্নিশ।

তাই বিভাজন তাই উথাল পাথাল
তবু ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র বিবাদের ভূমি
লক্ষ লক্ষ জতুগৃহ, সহস্র সহস্র
দ্রৌপদীর লজ্জাহরণ, কোটি কোটি
গান্ধারীর বুকফাটা আর্ত্ত হাহাকার।

তবু দ্রাবিড় ভূমির স্বাতন্ত্র্য-ঘোষণা,
নাগা-মিজো-বোরোদের স্বাধীন আব্দার,
তবু কাশ্মীর পাঞ্জাবে উগ্র রক্ত স্রোত
ষাটের দশকে মাওবাদী সশস্ত্র বিপ্লব
দলিতদের বুকে কর্ণের চাপা অভিমান।

বিবেক-অর্জুন-বাণে শতবিদ্ধ আমি,
এফোড় ওফোড় দেহ মাটি হতে উড্ডীন,
তীর বেয়ে টপটপ রক্ত ঝরে কুরুক্ষেত্র 'পরে ;
তবু আমি বেঁচে আছি, বেঁচে থাকবো ততদিন
যতদিন ধর্মরাজ্য চারিদিক থেকে হবে সুরক্ষিত।

ডাইনোসারাস

শুয়োরের বাচ্চাদের কানাঘুষো শোনা যায়
দিনের প্রদীপ্ত আঁধারে কিংবা রাতের নিশ্ছিদ্র আলোয়
বলদীপ্ত আত্তিলার কিম্বা দস্যু চেঙ্গিস খানের
অথবা ঠ্যাং ভাঙ্গা তৈমুরের বা গোঁয়ার ব্যালবোয়ার।

তাঁতার ঘোড়ার টগবগ দিগ্বিদিক উন্মত্ত খুঁড়ে
হিংস্র উত্তাল কাবশির নিষ্ঠুর দুরন্ত গতিতে
খাল বিল নদনদী দাবানল দগ্ধ পোড়ামাটি ঘিরে
হাবু-ডুবু খায় যত নিরীহ মানুষ আর্তনাদে।

শুয়োরের বাচ্চাদের তবু তিড়িং বিড়িং নাচ
তাদের বিকট হাসি বোমার মত ফেটে পড়ে
ছুটে ধোঁয়া উড়ে বালি উথাল পাথাল পৃথিবীর বুকে
যেন কোন সর্বভূক ডাইনোসারাস লম্বা জিভ মেলে।

শুয়োরের বাচ্চাদের লোভের শেষ নেই তবু
সব কিছু গ্রাস করে একক জগতে অমর হতে চায়।

হে ঈশ্বর

হে ঈশ্বর, তোমাকে আমি দেখেছি স্বচক্ষে !
তোমাকে দেখেছি অন্ধকার যুগে ;
আদিম হিংস্র কুটিল বন্যতায় ;
আফ্রিকার নিশ্ছিদ্র তমস অরণ্যে !

তোমাকে দেখেছি ধূর্ত শেয়ালের চোখে ;
শ্বেত শুভ্র যাজকের ঘৃণ্য আলখাল্লায় ;
ফন্দিবাজ পুরুতের অনিবার্য্য ফাঁদে ;
কাজির নজিরবিহীন নগ্ন উন্মাদনায় !

তোমাকে দেখেছি পৈশাচিক দাঙ্গায় ;
দুর্ভিক্ষ বন্যা, আর মারী, মন্বন্তরে ;
মূর্ত্তিময়ী করুণার সাহায্য ডালায় ;
অলৌকিক ঘটনাবহুল বাতাবরণে !

তোমাকে দেখেছি অসহায় নারীর ক্রন্দনে ;
কী ভীষণ পৈশাচিক নরক যন্ত্রণায় ;
বুভুক্ষায় নাড়ি ছেঁড়া ক্ষুধার তাড়নে ;
ভবিতব্যের দুর্বোধ্য জটিল ভাষায় !

হে ঈশ্বর তোমাকে আমি দেখেছি স্বচক্ষে !
মরুময় মরীচিকা গোলক ধাঁধায় ;
বস্তুহীন কল্পনার স্থবির আবর্ত্তে,
আত্ম প্রবঞ্চনাময় গভীর রহস্যে !

নগ্নিকা

কী অদ্ভুত সেই নারী
দেহ পসারিণী সেজে
আমার এই ঘরের ভেতর
নগ্ন হয়ে বিছানার 'পরে
আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল

আদিম পোষাকে সজ্জিত
আমি তার নাভি-মূলে হঠাৎ
চির প্রেমী লিও-লিসা
কোনারক খাজুরাহী
মূর্ত্তির মতন বিমূর্ত দেউল

স্মৃতিপটে গইয়ার ছবি
পিকাসোর জ্যামিতিক রেখা
রেমব্র্যান্টের ঘনক ফলক
ভ্যান গগ কৃত ভাস্বর দর্পণ
দুর্গার হাতে বিদ্ধ নত অসুর

মনে এল টোরসোর উৎস
সুঠাম আঙ্গিক গঠন কৌশল
দেহাতীত সৌন্দর্য্যের খনি
জৈবিক ক্ষুধার বিকার যেথা
বিপরীতমুখী সংখ্যা থেকে শূন্যে

ভোরবেলা তবে সেই নারী
নাগরিক আচ্ছাদনে উঠে চলে গেল
দূরে কুয়াশার প্রান্তে প্রেতচ্ছায়া
আমি নগ্ন পৃথিবীর দিকে চেয়ে
আর সূর্য্যরেখা ক্যাকটাস ঘিরে।

বিয়েত্রিস

ছোট চুলে, বিয়েত্রিস, ভুর্ষণ্ড তোমার
কাকে বেঁধে নিতে চাও শেষ অব্দি বল ?
বেলা শেষ—অস্ত রবি—সন্ধ্যে হয়ে আসে ;
পাখির কূজন শ্রান্ত ভরে দশ দিক ;
হিমেল শীতল ছায়া অতল গভীরে ;
ঋতুবন্ধে তবু প্রায় প্রসব-যন্ত্রণা।

আগাছা জন্মেছে কত পাম গাছটায়—
সোনালী মুখের 'পরে কালো কালো ছায়া ;
কাঠঠোকরারা কুরে খায় ন্যুব্জ বুক ;
অতি বরষণ 'মূলে শ্যাওলা জঞ্জাল !

কখনো হয়না মনে হায় বিয়েত্রিস,
অতল গহ্বর থেকে পেতে কারো সাড়া !
আগাছারা লুটোপুটি প্রজন্ম গুল্মজে—
ব্যঙ্গ ভরে উঁকি মারে তোমার কোটরে !

কখন কী হয় কবে

অবশেষে ভেঙ্গে গেল বার্লিন-দেয়াল
আরো দূরে পূবে চলে তারই মহড়া
ভর দুপুরের বুকে মস্ত দাঁড়কাক
কালো ছায়া মেলে তার কর্কশ রেয়াজ
জাপানীরা ক্রেশো-ভাষ্যে পিঁপড়ের জাত
ব্রিটেন-মার্কিন শুধু শান্তির প্রহরী
সোভিয়েত ডিগবাজী গর্বাচভী সঙ্
লেনিন-স্ট্যালিন-মূর্ত্তি যায় গড়াগড়ি

বাম হল ডান আর ডান হল বাম
ধ্বংসের কর্ত্তারা আজ শান্তির পূজারী
সমাজ-মুক্তির হাত সমাজ বিধ্বংসী
নিরন্ন তৃতীয় মূক বিশ্ব দিশেহারা
শুধু চীন চিন চিন বুকের ভিতর
কখন কী হয় কবে কে বলবে আর !

ইরান-পোল্যাণ্ড

ইতিহাস স্তব্ধ হয় জানি ক্ষণকাল,
অনন্ত গতির মাঝে ক্ষণিক বিরাম।
কিন্তু হায় এ যে দেখি বিপরীত গতি,
তলিয়ে যাবার এক বিরাট দুর্মতি।
মোল্লাতন্ত্র পোপতন্ত্র যমজ সন্তান,
মন্ত্রবলে অন্ধকারে দেয় পিছুটান।
চির মৃত্যু পথে হায় চায় চিরশান্তি,
শ্বেত আলখাল্লা মাঝে ক্রুর কৃষ্ণকান্তি।
ক্ষণিকের বিহ্বলতা জানি যাবে কেটে,
ক্রুশবিদ্ধ রোম যথা যীশুখৃষ্ট পটে।
জাগ্রত জনতার ঐ প্রচণ্ড আক্রোশ,
ঢালিবেই অগ্নিগিরিসম তার রোষ।
ক্ষুদ্র গণ্ডি মাঝে এই ক্ষুদ্র তুচ্ছ জয়,
বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হার মানিবে নিশ্চয়।

রুদ্রলোক

পুরাণের বক্ষ হতে জন্ম নিয়ে যারা
সভ্যতার আলোকের প্রথম রশ্মিতে
দীপ্তিমান কীর্ত্তিমান মহাজাতি বলে
ধরাতলে চলেছিল দৃঢ় পদ ফেলে,
সৃষ্টির ভাণ্ডারে যারা অকৃপণ হাতে
ঢালি দিল জীবনের সবটুকু প্রাণ
অকৃতজ্ঞ সমাজের ব্যর্থ বিনিময়ে
পিষ্ট হয়ে কালরথ-চক্রতলে ; তারা
আজ বড় অসহায় বড়ই করুণ
ভুলি নিজ জন্মকথা জয়গাথা আর
নিরমম বাস্তবের অকূল পাথার
পার হয় নাই হেন কাণ্ডারী তরুণ ;
মৃত্যুরে করিবে জয় ভুলি নিজ শোক
সম্মুখ পশ্চাতে ওই দীপ্ত রুদ্রলোক।

ধর্ষিতা

গাণিতিক নিয়ম কানুন
মেলে না তো কখনো-সখনো ;
চার আর চার আট,
কিম্বা চার চারে ষোল ।
পথের বিপথ খোঁজা,
রীতির বিপরীত যাওয়া ;
গরমিল আবর্জনা,
অতি তড়িঘড়ি পাওয়া ;
সাময়িক ক্ষণিক প্রহর,
দৃষ্টিহীন সমুখের লেখা ;
অসতীর ভালে শোভে
সতীর কলঙ্ক রেখা ।

ঈশ্বর সে

আকাশের রং বদলে যায় অহরহ
কার ইঙ্গিতে
ঈশ্বর সে ।

নীল রং ঘন কালো দৈত্য হয়ে ওঠে
কার ইঙ্গিতে
ঈশ্বর সে ।

সাদা রং হঠাৎ পিঙ্গল বর্শা-ফলক
কার ইঙ্গিতে
ঈশ্বর সে ।

স্বীকারোক্তি

এক

মা বলে খোকাকে ডেকে, ওরে ওঠ উঠবিনে ?
রুদ্দুর এসে গেছে, দ্যাখ, পড়তে বসবিনে ?
বললি যে তুই অত করে রোজ ভোরে উঠবোই,
দেখো তুমি ভুল হবে না ছোট্ট ডাকটি বই !
এখন দেখি ডেকে ডেকে হন্দ হলেম আমি,
তবুও তোর চোখের পাতায় ঘুম যায় না থামি !
রোজ ভোরে তুই উঠবি নাকি উঠবি সবার সাথে,
উঠবি আনু মানুর সাথে উঠবি ইতার আগে !
এই বুঝি তোর কথা রাখা, ওঠ বলছি এবার !
নইলে সবাই দেখবি এসে করবে ছিছিকার।

দুই

চেয়ে দ্যাখ ঐ সবুজ পাতা কেমন ঝলমল,
রোদের রঙে মিশে সে পরেছে সোনার মল।
দ্যাখনা চেয়ে জাম গাছেতে টিয়া পাখির বাসা,
সোনার রোদে স্নান করে ঐ দেখায় কেমন খাসা ?
দ্যাখনা চেয়ে পুকুর পাড়ে হাঁসা-হাঁসীর দল,
কেমন করে চলছে যেন ছবি অবিকল।
কেমন করে ডুবছে ওরা, উঠছে কেমন করে,
সাঁতার কেটে কেমনে বা যাচ্ছে সারে সারে।
দেখনা কেমন এদিকে ঐ চড়ুই পাখি এসে,
জানলা দিয়ে চলে গেল চুপি চুপি হেসে।

তিন

যেইনা বলা খোকন সোনা এক লাফেতে উঠে,
বলে মাকে, কোথায় গো মা চড়ুই গেলো বটে ?
মা বলে 'দ্যাখ দেউড়ির ঐ নিচের ঘরে যেয়ে,
চড়ুই ভায়া বসলো তোর মুখের দিকে চেয়ে।
খোকন বলে, বলোনা মা হাসছে চড়ুই কেন,
কেন অমন চেয়ে আছে আমার দিকে হেন ?

মা বলে, বলছে তোকে, আমি ছোট্ট পাখি,
কত ভোরে উঠি আমি তোমায় পিছু রাখি।
আমার চেয়ে বড় তুমি, মানুষ তুমি বটে,
আমার মতো তবু তোমার সুনাম নাহি রটে।

চার

মায়ের মুখে যেই না খোকন পাখির কথা শুনি,
এক লাফেতে বিছানা ছেড়ে উঠল সে তকখনি।
নিজের কাজে খোকন আজি লজ্জা পেলো ভারি,
হঠাৎ সে তাই মায়ের বুকে মুখ লুকালো তারি।
মানুষ হয়ে পাখির কাছে এতো বড়ো হার,
কেমন করে সইবে সে তার ভেবে পায় না আর।
মায়ের কাছে খোকার তাই প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
কক্‌খনো না হবে মাগো কক্‌খনো অমন !

প্রশ্নোত্তর

'মাগো, বলো ভূত তুমি দেখেছো কখনো ?'
উত্তরে বললে সভয়ে মা মেয়েকে, 'না তো !'
'তবে যে তুমি রোজ ভূতের বলো কথা।'
'তোর বাপের মুখে আমি শুনি যে তা !'
বাবাকে শুধায় তাই মেয়ে, 'ভূত আছে ?'
'শুনেছি বাবার মুখে, আছে গাব গাছে।'
'বলো না, চোখে কি দেখেছো কোন দিন ?'
'বলিস কী, শুনেই পরাণ উড্ডীন !'
বলে ঠাকুরদাকে গিয়ে, 'ভূত কোথা ?'
'আছে তাল, নিম, গাব গাছে হোথা।'
'দুচ্ছাই, দেখেছো কখনো নিজ চোখে ?'
'বাপরে, তিন সন্ধ্যে বলিস কী সে !
যে দেখে, সে কাঠ হয়ে যায় সেই ক্ষণে,
বিকট ভীষণ রূপে হারায় প্রাণ ধনে।'

বন মাঝে ছুটে গেল ছোট্ট সেই মেয়ে,
দাদু বাবা ত্বরা করি লয় পিছু ধেয়ে
তিন সন্ধ্যা-ক্ষণে মেয়ে ওঠে গাব গাছে,
পরমাদ গুনে সবে ঘটে কিছু পাছে।
গাব-গাছ ডালে উঠি বলে মেয়ে সবে,
'ভূত ভায়া, কোথা তুমি দেখি মুখ তবে!'
এই বলি মগ ডাল ধরি দেয় নাড়া,
কাল পেঁচা উড়ে যায় খেয়ে সেই তাড়া।
'দেখো দাদু বাবা দেখো, ভূত উড়ে যায়,
ভূত কোথা! এযে পেঁচা, দেখো সবে তায়!
ভূত ভূত মনগড়া কথা বলো নাকো,
দেখোনি যা, তা নিয়ে চুপ করে থাকো।'
দাদু বাবা বলে, 'তুমি এসো নেমে লক্ষ্মী,
ভূত নয়, জানি এবে ওযে এক পক্ষী।'

যাযাবর

চাল নেই চুলো নেই,
সবক্ষণে সুখী তেই!
হেথা হোথা তাবু ফেলে যারা বাঁধে ঘর,
সকলের মুখে শুনি ওরা যাযাবর!
আজ যেথা সুখে রয়.
কাল তার আয়ুক্ষয়।
সবকিছু ছেড়ে দিয়ে খোঁজে অন্য দোর,
সকলের মুখে শুনি ওরা যাযাবর!

গরু ঘোষ নিয়ে সঙ্গে,
পিঠে মোট সদা রঙ্গে,
যারা চলে হাসিমুখে বৃষ্টি ঝর ঝর,
সকলের মুখে শুনি ওরা যাযাবর!

কঠিন মরুর বুকে,
কাঁধে নিয়ে শিশু সুখে,
যারা চলে অবহেলে প্রান্তর উষর,
সকলের মুখে শুনি ওরা যাযাবর !

দুর্গম পাহাড় পথে,
বর্ষার তীব্র ঘাতে,
যারা চলে আনমনে ঐ তুষার উপর,
সকলের মুখে শুনি ওরা যাযাবর !

বরফের ঘর বাড়ি,
শীত যেথা পাতে আড়ি,
শ্লেজ-গাড়ী সদা হয় যার সহচর,
সকলের মুখে শুনি ওরা যাযাবর !

কবি গায় কাব্যগাথা,
যাযাবরী রোমাঞ্চতা,
জীবনের কল্প-রস ঢালি যাদের 'পর
সকলের মুখে শুনি ওরা যাযাবর !
দূরে থেকে কাব্য নয়,
কাছে গিয়ে সাথী হয়,
কিছুদিন পর তবে শুনি অন্য স্বর,
মানুষ হতে চাই আর নয় যাযাবর !

নারী-বর্ষ

ঘর-কোণ ছাড়ি যেতে তার আড়ি মাথায় ঘোমটা বড়ো,
যবুথুবু বেশে থাকে হেঁসেলেতে সদা ভয়ে জড়োসড়ো।
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ভাবে মনে মনে এ যে ভাগ্য লিখন,
পুরুতের দল চাহে অবিকল ধরমের মিলন।
এক পুরুষের নাহিতো দোষের শত নারী দাবীদার ;
এক নারী যদি কভু লয় সঁপি আর কোন পতি তার,

কাজির বিচার নেমে আসে তার জীবনের প্রতি পদে
তবু শেষে হায় দিতে প্রাণটায় অমোঘ নিয়তি হুদে।
প্রতি সন হায় জন্ম দিতে মায় দেহ হয়ে গেছে ক্ষীণ,
ছেলে কিম্বা মেয়ে যারা আসে ধেয়ে হতে থাকে শুধু দীন!
যারা আসে তার শুধু সিকি ভার বেঁচে থাকে পৃথিবীতে,
দীর্ঘশ্বাস মা'র শুধু হাহাকার রূপ নেয় সংগীতে।
বোরখায় মুরে চলে নিয়ে ঘুরে যথা পথ ভিখারিনী,
শিশু বানাবার যন্ত্র শুধু সার এই সব অভাগিনী!
তবু শেষে হায় তালাকেতে চায় পুরুষের চতুরাদি,
পুত্র কন্যা দলে পথে পথে চলে খোর পোষ নাহি ডালি!
নারী পুরুষের সম অধিকার বাণী বিঘোষিত শর্তে,
কয় জনা নারী পায় সমাজেরই উচ্চ পদ পরিবর্তে।
সিরীমাভো, গোল্ডা অথবা ইন্দিরা কিম্বা মাদাম থ্যাচার,
পুরুষের গড়া তার হাতে মোড়া এক বিশেষ আকার!
মহাকাশ যুগে নারী মরে ভুগে সেই সামন্ত-বেড়িতে,
মুক্তির আশায় আকাশেতে চায় ওই অরুণ-রশ্মিতে।

মাস্তান পাঁচালী

এক

একমেবাদ্বিতীয়ম আমি এ পাড়ার;
সবে বলে মোরে এক দুঁদে জায়গীরদার!
বেপাড়া যাইনা কভু জানিনা কেমন,—
এ পাড়া আমার আমি ছাড়িনা কখন!

দুই

যারা বাস করে সবে মোর আওতায়,
অনাথের মত আমা মুখ পানে চায়!
সন্তানের মত আমি করি যে পালন,—
এ পাড়া আমার আমি ছাড়িনা কখন!

তিন

ওদের দুঃখে কষ্টে চোখে সেই ঘুম,
ওদের উৎসবে তাই করি মহা ধুম !
ওদের মধ্যেই মোর চির পাতা আসন,—
এ পাড়া আমার আমি ছাড়িনা কখন।

চার

ঝড় ঝঞ্ঝা এলে পরে পেতে দিই বুক,
গিরিধারী সম আমি লই সব দুখ !
এমন সুহৃদে বিরোধ কেবা সে অধম,—
এ পাড়া আমার আমি ছাড়িনা কখন !

পাঁচ

জগতে কোথা কি হয় নাহি তাতে স্পৃহা,
কোথা কোন বাহার শোভে লোকে বলে আহা !
ওদের স্মৃতি মনে সদা মূর্তিমান,—
এ পাড়া আমার আমি ছাড়িনা কখন !

ছয়

নিন্দুক বলে জানি দূরে নানা কথা,
এ পাড়া এলেই তার শুধু নিরবতা !
শেষে রটে অন্য কথা আমি এক মাস্তান,—
এ পাড়া আমার আমি ছাড়িনা কখন !

সাত

ভুলে যদি কভু যাই অন্য কোন পাড়া,
তটস্থ থাকি সদা শিরে যেন খাড়া !
তবু শেষে খেতে হয় কুত্তার তাড়ন,—
এ পাড়া আমার আমি ছাড়িনা কখন !

আট

কোন্ বনে ফোটে ফুল কোন্ পাখি গায় গান,
কোন্ লহরী পরশ লাগি প্রাণ করে আনচান।
ওসব নিয়ে কাব্য করুক কবিরা যেমন,—
এ পাড়া আমার আমি ছাড়িনা কখন !

ইয়েলৎসিন কথামৃত

ইয়েলৎসিন, ইয়েলৎসিন,
নাচছো তুমি তাধিন ধিন!
মসকো এখন তোমার মুঠোয়,
গরবা তোমার পায়ের চেটোয়,
রুশীদের নাক উঁচু থাক চিরদিন।
ইয়েলৎসিন, ইয়েলৎসিন,
নাচছো তুমি তাধিন ধিন!

দোকানেরা সব নয়কো মানুষ,
তোমার কাঁধে ওড়ায় ফানুস,
যাযাবর নয় শুধু ওরা বেদুইন!
ইয়েলৎসিন, ইয়েলৎসিন,
নাচছো তুমি তাধিন ধিন!

হয় যদি রাতারাতি সবাই সমান
কোথায় থাকে বলো তোমার সম্মান!
গোপনে শুধলে তাই মহা-প্রভু-ঋণ!
ইয়েলৎসিন, ইয়েলৎসিন,
নাচছো তুমি তাধিন ধিন!

তৃতীয় বিশ্বের সব যত ছোটলোক,
মরে যদি ওরা তবে সবাই মরুক,
বোঝা বয়ে রুশ কেন হতে যাবে দীন?
ইয়েলৎসিন, ইয়েলৎসিন,
নাচছো তুমি তাধিন ধিন!

তার চেয়ে বরং তুমি মেদ-ভুঁড়ি নিয়ে
ওদের মতন করো দু-ডজন বিয়ে,
মাঝ রাতে নাইট-ক্লাবে বাজাও সে-বীণ!
ইয়েলৎসিন, ইয়েলৎসিন,
নাচছো তুমি তাধিন ধিন!

রাণীর ফর্মান

ফর্মান দিল রাণী, শুনহ মোর বাণী—
গণতন্ত্রের কাঁধে, আমলাতন্ত্র-ফাঁদে
সমাজতন্ত্র দেশে আসবে বলছি শেষে।
সময়টা তো চাই. চালিস পচাস নাই।
দেশটা বড় কতো এক মহাদেশ মতো,
ভূগোলে পড়োনি কি ইকির মিকির চিকি।
গোটা বছর একশ দিতে হবে ট্যাকশ,
তবে একটি দেশ, হয় পরিপাটি বেশ।
ততদিন আমি, ফির ছেলে নাতির ভিড়।
তাই লক্ষ্মী হয়ে থেকো দুষ্টুমি করো নাকো।
যদি কর বেয়াদপি, তো সাজা পাবে ঠিকই,
তৈরী পুলিস সৈনিক পিটিয়ে করবে ঢিট।

শিক্ষক ও ছাত্র

ব্যোমকেশ মাষ্টার হিটলারী গোঁফ তার,
ক্লাসে এলে তিনি হায়, পিন পড়া শোনা যায়।
ইংরেজী পড়াবার কেউ নেই জুড়ি তার।
দাঁত খিঁচে তিনি কন "উঠে দাঁড়া সনাতন।
'পূর্বদিকে সূর্য্য ওঠে অস্ত যায় পশ্চিমেতে'—
ইংরেজী অনুবাদ বল দেখি সোনাচাঁদ।"
সনাতন বলে, "স্যার, ভূগোলের মাষ্টার
বলেছেন, 'সূর্য্য স্থির, গতি রয় পৃথিবীর
আর গ্রহ অন্য সবে',—তবে কি সূর্য্য ওঠে ডোবে?"
যুক্তি বানে হয়ে কাবু রেগে কন ব্যোমবাবু,
"চুপ কর বদমাস্, এটা কি ভূগোলের ক্লাস?
ইংরেজী ভূগোলেতে তুলনা হয় কোন মতে?"

তার মৃত যোদ্ধা এল জয়ি সমর-প্রাঙ্গণ

তার মৃত যোদ্ধা এল জয়ি সমর-প্রাঙ্গণ,
তথাপি না মূর্চ্ছি'ল না করিল ক্রন্দন !
সেবিকারা সবে কহিল ত্বরিত,
ওকে কাঁদাতেই হবে নতুবা মৃত্যু নিশ্চিত।
তখন সবাই তার গাইলো জয়গান,
ভালবাসা শুধু তার হৃদয়ের দান
মহত্তর শত্রু তথা বৃহত্তর মন।
তথাপি না মূর্চ্ছি'ল না করিল ক্রন্দন !
পরে সেবিকা এক নিল নিজস্থান,
চুপি চুপি গেল যেথা আছে যোদ্ধৃস্মান,
খুলি দিল ত্বরা করি তার মুখাবরণ।
তথাপি না মূর্চ্ছি'ল না করিল ক্রন্দন !
নব্বই বয়স্কা এক ধাত্রী অবশেষে
একমাত্র পুত্র দিল মাতৃ ক্রোড়-পাশে।
বৈশাখী ঝঞ্ঝাসম তবে আসিল ক্রন্দন,
'ওরে বাছা, তোরই তরে রাখি এ জীবন।'

ক্যাগি আমার ক্যাগি

ক্যাগি আমার ক্যাগি,
এবার করবো তোকে ম্যাগি !
যার শীস যার নোড়া,
তারই ভাঙ্গিস দাঁতের গোড়া !
এবার ঘর-ছাড়া হবি তুই মাহবীর ত্যাগী !
ক্যাগি আমার ক্যাগি,
এবার করবো তোকে ম্যাগি।
দুধ-কলা দিয়ে পুষি
কাল-সাপ দিবানিশি !
এবার যাতা-কলে পিষে মেরে প্রমাণ করবো আমি জ্যাগি।
ক্যাগি আমার ক্যাগি
এবার করবো তোকে ম্যাগি !

লোড্‌ শেডিং

শেডিং শেডিং লোড্‌ শেডিং
হাট্‌টিমা টিম্‌ টিম্‌ !
দারিদ্র্য প্রাচুর্য্য দুই ভাই,
গর্ব ভরে করে সাফাই !
উপগ্রহ ওড়ে শূন্যে,
বধূ-হত্যা চলে নিম্নে !
আণবিক বোমা ভারে,
হরিজন পুড়ে মরে !
শেডিং শেডিং লোড্‌ শেডিং
হাট্‌টিমা টিম্‌ টিম্‌ !

ভক্তি-যোগ

রথ-মেলা পথ-চলা বড়ই দুষ্কর,
ভিড় ঠেলে সবে বলে সর সর সর।
অবশেষে দেব-পাশে পেঁাছে যায় মায়,
সস্নেহেতে খেতে যেতে কহেন কন্যায়,
"চিনি-কলা ধূপ-শলা দাও দেব ঠায়।
ভক্তিভরে করজোড়ে প্রণম তাহায়।"
কন্যা কয়, "নাহি লয় ভক্তি অন্তরেতে,
হাত কাটা বেটে গাট্টা দেখি জগন্নাথে।
ভক্তি মোর চির ডোর থাক তব পায়,
জগন্নাথ ঠুটোহাত কী করে আমায় !"

গোঁফ ও দাড়ি

দাড়ি বলে, মানুষের একী দুরমতি,
আমা ফেলে দুই রেখ গোঁফ লয় ইতি !
শুনে কহে গোঁফ তায়, ওহে ভাই দাড়ি,
আমা সনে তুমি কেন মিছে কর আড়ি !
আমা ছাড়া তুমি দেখ নিতান্ত অসার,
গোঁফহীন দাড়ি বল কে রাখিবে আর !

সত্যজিৎ রায়

সত্যজিৎ নাম সে তো সত্য বটে ঠিক,
সব কণ্ঠ বলে ওঠে টিক্ টিক্ টিক্।
অপুত্রয়ী ছবি হরি নিল বিশ্বজয়,
গুগাবাবা ঢোলকেতে তার পরিচয়।
ম্যাগসেসে, দেশরত্ন, বিশেষ অস্কার,
অবহেলে দোলে যেন তব কণ্ঠহার।
দেশ বিদেশের সব ছোটে এই বঙ্গে,
শোনাতে বিজয়-গাথা অভিনব রঙ্গে।
অকস্মাৎ তুমি হায় কোথা গেলে চলে,
কত কাজ ফেলে রেখে কাউকে না বলে।
দৈববলে গুগাবাবা পেল তিন বর,
সর্বগুণী তুমি কেন রবে নিরুত্তর।
ভূতের রাজার এক বর নিয়ে সোজা,
আমাদের মাঝে এসো আবার একদা।

কে সে

কে যেন আমাকে মাঝে মাঝে স্পর্শ করে
তাকে ধরতে পারিনা তাকে বুঝতেও পারিনা
অলীক বলে তাকে দূরে ঠেলে রাখি
কিন্তু তার হাতছানি আমাকে উদ্বেল করে
একটা অস্পষ্ট আদল একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত
সূর্য্যরশ্মি ভেদ করা এক সূক্ষ্ম অবয়ব
মাঝে মাঝে আমি তাকে ধরতে চেষ্টা করি
আলেয়ার মতো সে যে কোথা চলে যায়
চরাচর মাঝে তাকে মেলে না কোথাও
গড্ডালিকা থেকে তার বহুদূরে স্থান
হয়তো অশ্লেষা কিম্বা মঘাতে তার বাস।
অশুভ ইঙ্গিত বলে দূরে ঠেলে ফেলি
তবু মাঝে মাঝে হাতছানি ইশারার ডাক
বিস্মৃতির তন্দ্রাজালে শুধু স্মৃতি খুঁজে মরে।

অ-যোদ্ধা

এক

উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের শিশু মরে হাজার হাজার,
রক্তনদী বয়ে যায় নগরনো-কারাবক আর বসনিয়ার বুকে,
খোদাতাল্লা তোমার টিকিটি সেখানে দেখে না তো কেহ !

দুই

ইথিওপিয়া সোমালিয়ায় নিরীহ মানুষ হায় মরে কোটি কোটি।
আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্যের জালে চিরশত্রু হয় আদিবাসী,
হে ঈশ্বর তোমার দেখা সেখানে পাইনা কেন প্রভু !

তিন

অযোধ্যায় ভুক্রিয়করণ তবু শত শত সেথা মরে অহেতুক,
মহাকাশ-যুগে পঞ্চাশ কোটির উপর নিরক্ষর এই দেশে,
অবতারী নারায়ণ তোমার চক্র বল তুমি কোথায় লুকোলে !

চার

তবে কান ধরে আল্লাকে উঠবোস করাও সবার সম্মুখে
গদাম করে ঈশ্বরের বুকে মারো এক লাথি
ঘার ধরে বার করে দাও নারায়ণকে এই ধরাধাম থেকে

পাঁচ

তারপর ? তারপর অউম শান্তি অউম শান্তি অউম শান্তি !

লিমেরিক

হুগলীর 'পরে যদি চাও পুল,
যদি হলদিয়া ফোটে পেট্রো-ফুল,
মাশুল নীতিতে যদি থাকে ভুল,
যদি বৈষম্য দূষণ প্রাণাকুল,
তবে 'মামেকং স্মরণং ব্রজ' ইতি মূল ॥

একটি তদন্ত রিপোর্ট

জানা গেছে তদন্তে—
সুইস-ব্যাঙ্কের গোপন একাউন্টে
টাকা জমা নেই কারো,
জমা আছে শুধু
লক্ষ লক্ষ কচি শিশুর কংকাল—
যাদের খুন করা হয়েছিলো
ইজম আর তন্ত্রের কবরে
দেশ-দরদের পাথর চাপা দিয়ে,
গীতা, বাইবেল, কোরাণের ফাঁস পরিয়ে,
ঘৃণ্য লালসার আগুনে পুড়িয়ে,
দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচীতে।

আমানতকারীর নামের তালিকায় —
নেই কোন গণদরদী রাষ্ট্রনেতা,
আছে একদল দেশদ্রোহী,
দাগী খুনী দস্যু, লুঠেরা—
অতি পরিচিত তাদের মুখ ;
বহু ঘরে ফটো শোভে সসম্ভ্রমে—
রুটির লোভে,
জীবনের ভয়ে।

প্রশাসন যাদের মুঠোয়,
ক্ষমতা যাদের পকেটে,
আইন যাদের খেয়ালে,
আদালত যাদের পানশালায়—
জনতা তাদের পায়ের তলায় ;
শেষ তদন্তে জানা গেছে—
তারা সব নির্দোষ।

তখন

তখন
স্বপ্নেরা নামতো স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে
মল বাজিয়ে পায়ে
কাঁকনের শব্দ তুলে
রামধনুর রং মেখে
হাওয়ায় সুগন্ধ ছড়িয়ে
প্রথম পাপড়ি মেলা
পরাগ-পিয়াসী লাজুক কুঁড়ির মত
নিঃশব্দ রাত্রির বুকে
স্বপ্নালু দু'চোখ জুড়ে।
রক্তে অব্যক্ত শিহরণ
ভালোলাগার প্লাবন এনে দিত
মনের দু'কূলে,
সুন্দরের হাসি ঝংকার তুলে
বাঁশি হয়ে বাজতো, রং ছড়িয়ে
আলো হয়ে ঝরতো,
নীরবমুখর তার দু'টি চোখ
হাত ধরে নিয়ে যেত
সীমাহীন আকাশের সীমানার পারে
তলহীন অতলের তলে
মৃত্যুহীন অনন্ত জীবনে
সৃষ্টির ঠিকানা খুঁজে পেতে।
স্পর্শোন্মুখ তন্ত্রীরা
প্রত্যাশার প্রহর গুনতো
মধুর উৎকণ্ঠায়—
তন্ন তন্ন করে অজানার নিভৃত গোপন
মনিকোঠার কন্দরে—প্রান্তে—সর্বত্র
অনাস্বাদিত সুধার সন্ধানে।
'আমি' হারিয়ে যেত আকাংক্ষিত 'তুমি'তে,
'তুমি' লুকিয়ে পড়তো ঈপ্সিত 'আমি'র মধ্যে।

তখন
সৃষ্টির উন্মাদনা ছিল পৃথিবীর বুক জুড়ে—
একটা প্রলয়ংকর ঝড়ের মত,
একটা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের মত।
কা'রো ভারী নিতম্ব,
পীনোন্নত পয়োধর, ক্ষীণ কটি
লতানো বাহুবল্লরী
বঙ্কিম অধরোষ্ঠ—
দুলে দুলে নিত্য-নোতুন ছন্দের জন্ম দিত,
ভূ-কম্পন জাগাতো হৃৎপিণ্ডে।
এক বিচিত্র আবেশে
দিশেহারা বিহ্বলতায়
উদ্দাম কামনার পাথর ঠুকে
থেতলে—গুঁড়িয়ে—
অস্তিত্বের আস্বাদন দিত—ঝলকে ঝলকে।
জগৎ-সংসার, লোক-লৌকিকতা,
ভদ্রতা-সভ্যতার আইন-কানুন—
একান্ত তুচ্ছতায় পড়ে থাকতো পায়ের তলায়।
তখন
যৌবন ছিল শরীরে কানায় কানায়।

মুখ ও মুখোস

মুখোসের নীচে মুখ লুকিয়েছে
চেনা মুখ চেনা ভার,
চিনি বলে যারে বলি বারে বারে
কিছু চেনা নেই তার।

চোখ প্রতারিত মন প্রতারিত
প্রতারিত ভালবাসা—
আপনার জন নয় সে আপন
মিছে শুধু প্রত্যাশা।

পিপাসার নদী মরীচিকা যদি
হতভাগা তৃষাতুর,
বুকজোড়া তার যত হাহাকার
কে আর করিবে দূরে !

আলো সে আলেয়া, কায়া মিছে ছায়া,
সত্যি সে অভিনয়,
যত কিছু আলো সব তার কালো,
সুধা হলাহল হয় !

জীবনের স্বাদ মরণের ফাঁদ,
বন্ধুর বুকে ছুরি,
পূর্ণিমা চাঁদে অমানিশা কাঁদে,
সন্তেরা করে চুরি ।

দেবতার বেশে দানবেরা এসে
ভালবেসে খুন চায়,
মিথ্যার দ্যুতি সত্যের জ্যোতি
মুখোসের মহিমায় !

কে কাঁদে কে হাসে, কে পালে কে নাশে,
কে চাহে কে ঠেলে পায়—
কেউ কি তা জানে কার কোনখানে
কি আড়ালে থেকে যায় !

আমি আমি নই, তুমি তুমি কই !
গোলকধাঁধাঁয় সব
দিশেহারা, মিছে মুখোসের নীচে
কোলাহল কলরব ।

কাঁদিছে মানুষ, হাসিছে মুখোস
অচেনারা অতি চেনা,
প্রকাশের লাজ ঢেকে দিতে আজ
মুখোসের বেচা-কেনা ।

হায় আল্লাহ্! হে ভগবান!

যিশুর মুখের শিশুর হাসি
বুশের মুখে উঠ্‌লো ফুটে,
হাজার টনের বোমার বহর
ইরাক পানে চল্‌লো ছুটে।

লক্ষ শিশুর বক্ষ চিরে
লাল পানিতে প্লাবন এনে—
শুকনো মরু, পাহাড় ঢেকে
গডের বান্দা সুনাম কেনে।

আল্লাহ্ খেলো গডের লাথি—
মোল্লা পেলো অক্‌কা,
হাজার হাজার ভাঙ্গা মসজিদ,
ইমাম খোঁজে মক্‌কা!

মুখে কুলুপ দালাল-ফ'ড়ে
সেকুলারিস্ট পীর-ফেরেস্তা,
তেলের পিঁপে জড়িয়ে শোভে
ওয়াশিংটনের সেরেস্তা।

ঘুম ভাঙ্গে না পিরামিডের ;
বুখারী তুই ধন্য রে!
চোখের পানি ফ্রিজে রেখে
প'ড়ো বাব্‌রির জন্য রে!

জবর খবর আল্লাহ্ খুন,
ঠুঁটো জগন্নাথের হাতে!
কাঁপছে কাবা, পাণ্ডারা সব
চাটছে মধু অযোধ্যাতে।

রাজরোগী

দয়া করে ডাক্তারবাবু—সারিয়ে দাও রোগটা ।

জাতের কোন ঠিক নাই,
মা-বাপের নাই নাম ঠিকানা—
সাক্ষী ইতিহাস ।
তবু, জাতের অহংকার হাড়ে হাড়ে ;
নবাবী বুলি, সাহেবী হালচাল ।
ভালো বুঝছিনে ঝোক্‌টা ॥

চুরি করি সারারাত—
সারাদিন চোর ধরি,
বাঁশ দিয়ে দেশটাকে—
দেশসেবী সাজি,
দু'পকেট ভরি খেতাম কুড়িয়ে,
রাজবেশ পরি, রাজসভা আলো করি,
ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দিই—
পেটে পুরে রাজভোগটা ॥

বলি এক—করি আর—
সত্যের ধার ধারি না,
নির্ভেজাল মিথ্যার কারবার ।
হিংসায় জর্জরিত মন,
ব্রত—অহিংসার বাণী বিতরণ ।
রবিঠাকুর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ নিয়ে ব্যবসা !
ভাবুন তো একবার—কি কুৎসিত লোকটা ॥

মন্দির মসজিদ গীর্জা
সবই দাবার ব'ড়ে ;
সুযোগে চালাই,
অট্ট হাসি কিস্তিমাৎ করে ।
কোরাণ, বাইবেল, গীতা—পড়িনা,
নিয়ে করি কারবার,

ভাড়াটে ক্যামিষ্ট বানায় পাচন
মোক্ষলাভ হেতু করি বিতরণ,
খেয়ে উল্লাসে সবে ছুটে আসে—
ভাই বাড়ি মারে ভাই-এর মাথায়,
বাড়িঘর সব আগুনে জ্বালায়—
খুনোখুনি হানাহানি এখানেই নয় শেষ—
ভাগ করে নেয় হাড়ি,
ভাগ করে নেয় দেশ !
কি সাংঘাতিক !
কি বর্ব্বর উদ্যোগটা ॥

দয়া করে ডাক্তারবাবু, সারিয়ে দাও রোগটা ॥

উলট পুরাণ

লোপ পেয়ে গেছে বুদ্ধি-সুদ্ধি
মুন্ডুটা গেছে ঘুরে—
দূরের মানুষ কাছে দেখি, আর
কাছের মানুষ দূরে।

গন্ধ শুঁকিয়া হিন্দুর পায়ে
মৌলবাদীরে খুঁজি
মুসলমানের সুরত দেখেই
সংখ্যালঘু তা বুঝি !

নেতা শুনে চিনি লাটবাহাদুর—
বড় বাড়ী—বড় গাড়ী—
সাত খুন মাফ্ জনতার বাপ্,
মিথ্যার কারবারী।

গণতন্ত্রের নাম শুনে ভয়ে
কেঁপে ওঠে সারা অঙ্গ,
ভোট-বাক্সের সেকি কাড়াকাড়ি !
প্রকাশিতে মহা রঙ্গ !

আমলা শুনিয়া হামলাবাজের
চেহারাটা চোখে ভাসে,
রক্ষক দেখে ভক্ষক জেনে—
প্রাণ কেঁপে ওঠে ত্রাসে।

দেশদ্রোহী দেখি দেশ-সেবকের
দুটি চোখে চোখ ফেলে,
নিরীহ ভেড়ার দল মনে পড়ে
'জনগণ' কানে এলে।

পাত্রী চাই

পাত্র ভালো তুলনা নাই,
রূপটা যেমন গুণটাও তাই ;
বংশ বড়, উঁচু জাতে—
পাত্রী চাই—আছে হাতে ?

মামদো ভূতের পিসির পোলা,
লম্বা দু'কান, দু'গাল ফোলা,
মুলোর মত দাত দু'পাটি
যেমনি শক্ত তেমনি খাঁটি,
ওপর ঠোঁট্‌টা ভালই কাটা,
উঁচু কপাল মধ্যি ফাটা ;
থ্যাবড়া নাকে বিরাট ফুটো
যায় ঢুকে দুই হাতের মুঠো ;
নাই ভুরু, চুল দু'চার গাছা
ঝুলছে দাড়ি, গোফ্‌টা চাঁচা।
বাপরে কী লোম সারা পিঠে !
দু'হাত লম্বা ; পেটটা চিটে।
সরু কোমর, চওড়া ছাতি,
লুফ্‌ছে বসে তিনটে হাতি।
মাংস কোথায় ! হাড় জির্‌জিরে,
রক্ত নাই সব—শুকনো শিরে।

তি'কোণ পায়ে খুঁড়িয়ে চলে,
নাঁকি আওয়াজ জড়িয়ে বলে।
অনেক বিদ্যে—আঁধার রাতে
হুতুম ধরে ন্যাড়া ছাতে।
মাছ চুরিতে সিদ্ধ হাত,
তালপুকুরে কাটায় রাত।
ব্যাঙের মাথা, ছুঁচোর ভুঁড়ি
খায় সে একা দু' দশ ঝুড়ি।

লম্বা সরু খ্যাংড়া পায়
হাওয়ার বেগে ট্যাংরা যায়,
লম্ফ দিয়ে এক নিমেষে
ইমফলে যায় মামার দেশে।
কম লেখে খুব, মোছে বেশী,
পোষাক পরে দেশ-বিদেশী।

শেয়ান বাপের জোয়ান ব্যাটা
যায় যেখানে বাধায় ল্যাটা,
কাজ করে না—বাপের খায়,
মুড়ো ঝাঁটার ভয়টা পায়।
এমন পাত্র আর দেশে নাই,
মনের মত পাত্রী পাই।

ঝংকার

ছল্‌ছল্‌ টল্‌টল্‌ জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে,
তর্‌তর্‌ ঝর্‌ঝর্‌ দর্‌দর্‌ ঝরছে।
হইহই রইরই টইটই কেন রে?
টস্‌টস্‌ ফস্‌ফস্‌ খস্‌খস্‌ যেন রে!
কানাকানি জানাজানি হানাহানি শেষ তো?
ফিট্‌ফাট্‌ মিট্‌মাট্‌ গিট্‌গাট্‌ বেশ তো!
ধরাধরি জড়াজড়ি গড়াগড়ি সয় না,
চট্‌পট্‌ ছট্‌ফট্‌ ঝট্‌পট্‌ হয় না।

কাটাকাটি ফাটাফাটি চাটাচাটি একি রে !
কোলাকুলি গোলাগুলি ঝোলাঝুলি সেকি রে !
বন্‌বন্‌ ঝন্‌ঝন্‌ শন্‌শন্‌ শুনেছি,
ঝকঝকে তকতকে লক্‌লকে গুনেছি।
ঘড়্‌ঘড়্‌ ফড়্‌ফড়্‌ কড়্‌কড়্‌ করে সে,
মড়্‌মড়্‌ চড়্‌চড়্‌ সড়্‌সড়্‌ পড়ে সে।
মারামারি বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি দ্যাখ্‌ না !
মন্‌তর্‌ যন্‌তর্‌ অন্‌তর্‌ এক না।
থানাদার হানাদার দানাদার হয় কি !
ছম্‌ছম্‌ গম্‌গম্‌ ঝম্‌ঝম্‌ সয় কি !

আজগুবি

ভাঁড়ামিতে ভাঁড় কই, জল নেই জলসায়,
গোল নেই, মাল নেই—গোলমাল থেকে যায়।
রাজা কোথা রাজগীরে—তাজ্‌জব কারবার !
ঘোড়া নেই ঘোড়াকল টিপে যায় বারবার !
নটবর বর নয়, বর কোথা পাইরে !
বারবার হামাগুঁড়ি—গুঁড়ি কোথা ভাই রে !
তালকানা তাল গাছে, ধামা নেই ধামাধরা !
মিছামিছি বিপাকেতে পাক খেয়ে পাঁকে পড়া।
একটাও নাই ভূত—তবু অদ্‌ভূত সব !
কল নেই অকারণ তোলে মিছে কলরব।
ইতিহাসে হাঁস নেই, তবু কেন উল্‌লুক
পালকিতে পাল খুঁজে তোলপাড় মুলুলুক !
বিল কোথা টেবিলেতে ! রং কোথা রংবাজে !
গিরি নেই—দাদাগিরি দিনরাত কার সাজে !
অবকাশে কাশ খুঁজে একি দশা হায় রে !
চুড়িদারে চুড়ি কেউ কোনোদিন পায় রে !
তাল যদি পেতো কেউ নেমে তালপুকুরে,
চশমার মা'কে ধ'রে কামড়াতো কুকুরে !

অষ্টরম্ভা

বলতে পারিস্‌

অণ্টরম্ভা কোথায় ফলে ?
আকাশে ? না, অথৈ জলে ?
মাটির নিচে ? গাছের ডালে ?
দারুণ শীতে ? বর্ষাকালে ?

জায়গাটা কি ? মাদাগাস্‌কার ?
হনলুলু ? না, হরিদ্বার ?
ইস্তাম্বুল ? স্যাল্‌ভাডোর ?
নেদারল্যাণ্ড ? বা, ম্যাসাঞ্জোর ?

কেমন সাইজ ? চ্যাপ্টা ? গোল
মোটা ? লম্বা—মধ্যি টোল ?
বেজায় বড় ? ছোট্ট বোটা ?
হাওয়ায় দোলে গোটা গোটা ?

কেমন খেতে ? তেতো ? কষায় ?
খুবেই খাট্টা ? অনেকটা ঝাল ?
একটু কটু, হালকা মিঠায় ?
সুস্বাদু খুব, খুবেই রসাল ?

রংটা কেমন ? সাদা ? কালো ?
হলদে ? সবুজ ? আরও ভালো ?
লাল ? গোলাপী ? ধুসর-ছাই ?
নীল ? বেগুনী ? তা-ও জানা নাই ?

মুখ্যুরে তুই গোবর-গণেশ
জ্ঞানগম্যি নাই ছিটেফোটা,
তোর কাপালে দুঃখু অশেষ
অষ্টরম্ভা গোটা গোটা ॥

বৌ এসেছে ঘরে

আয় লো তোরা দেখ্‌বি যদি
আয় লো ত্বরা করে,
অনেক দিনের পরে
বউ এসেছে ঘরে,
লাল টুক্‌টুক্‌ নোতুন বউ-এর
গাল টুস্‌টুস করে।

ঝিক্‌মিক্‌ ঝিক্‌মিক্‌ জরি,
চাঁদমুখে ফুলপরী,
ডাগর ডাগর কাজল চোখে
জল চিক্‌চিক্‌ করে।
নীল নভে চাঁদ বাঁকা
সিঁথির সিঁদুর আঁকা
ঝিলিক্‌ ঝিলিক্‌ বিজলী চমক
লাল ঠোঁটে যায় ঝরে !!

গোলাপ গালে টোল,
নোলকে খায় দোল,
ফুলের সাজে ফুল-কুমারীর
রূপ ধরে না ঘরে।
আলতা পরা পা
সোনার বরণ গা
ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজে
সোহাগীর পা ধরে ॥

ঘোমটা টানে লাজে
সোনার কাঁকন বাজে
আল্‌তো খোঁপায় গুঁজতে কাঁটা
ঠিক্‌রে মাণিক ঝরে।

চরণ ফেলে যদি
উছলে পড়ে নদী
মরা গাঙে ভরা জোয়ার
ছলাৎ ছলাৎ করে।
আয় লো তোরা দেখবি যদি
আয় লো ত্বরা করে⋯ ॥

আমি এলাম তোমার কাছে

আমি এলাম তোমার কাছে
শূন্য দু'হাত পেতে,
আমি এলাম তোমার কাছে
দেবার নেশায় মেতে।
আমি এলাম তোমার কাছে
ঘোমটা টেনে লাজে,
আমি এলাম তোমার কাছে
আমার নগ্ন সাজে।

আমি এলাম তোমার কাছে
ভরতে ফুলের সাজি,
আমি এলাম তোমার কাছে
মরতে হয়ে রাজি।
আমি এলাম তোমার কাছে
শুনিয়ে যেতে গান,
আমি এলাম তোমার কাছে
জুড়িয়ে নিতে প্রাণ।

আমি এলাম তোমার কাছে
উজাড় করে দিতে,
আমি এলাম তোমার কাছে
পাত্র ভরে নিতে।

আমি এলাম তোমার কাছে
ভরা গাঙের বান,
আমি এলাম তোমার কাছে
করতে শিশির-স্নান।

আমি এলাম তোমার কাছে
ফোটা ফুলের মালা,
আমি এলাম তোমার কাছে
জ্বলতে সুখের জ্বালা।
আমি এলাম তোমার কাছে
বাঁধন পরার সাধে,
আমি এলাম তোমার কাছে
মুখ লুকোতে চাঁদে।

আমি এলাম তোমার কাছে
হাতে হাজার বাতি,
আমি এলাম তোমার কাছে
খুঁজে আঁধার রাতি।
আমি এলাম তোমার কাছে
অনেক ভালবেসে,
আমি এলাম তোমার কাছে
বিদায় নিতে হেসে।

এক যে আছে চোরের দেশ

এক যে আছে চোরের দেশ সবাই সেথায় চোর,
কেউবা সিঁদেল গাঁটকাটা ঠগ কেউবা ঘুষখোর।
ছিনতাইবাজ পকেটমার ডাকাত-খুনি ভাই ভাই,
জালিয়াত আর চিটিংবাজ কোন কিছুর অভাব নাই।

চোরের ঘরে চোরের হানা পকেটমারের পকেটমারী
গাঁটকাটার গাঁট যাচ্ছে কাটা, চোরের দেশে মজা ভারি!

রাজার চুরি রাজার মত—হাজার কোটির ঘরে বাঁধা,
উজির নাজির দাও মারে সব সুযোগ বুঝে পেলে আধা।
প্রজার চুরি অল্প সল্প, যে যেমন পায় তা'তেই খুশ্,
ব্যবসাদারের লোভটা বেশী, যেমন আমলা তেমনি ঘুষ।

চোরের দেশের কড়া কানুন—থাকতে হবে সাধুর বেশে,
সত্যি বলার শপথ নেবে, মিথ্যা হাজার বলবে হেসে।
চোরের রাজা শাসন করেন ধর্মমতে চোরের দেশ,
যে যেমন চোর তার তেমন পদ, সংবিধানের নিয়ম বেশ!
চোরের দেশের আজব বিধি চোরা টাকার রঙ্‌টি কালো,
চুরির বিচার করছে চোরে সত্য-ন্যায়ের জেবলে আলো!
চোর আসামী চোর দারোগা চোর কয়েদি জেলার চোর;
চোরের দেশে চুরির সাজা যাচ্ছে শোনা খুব কঠোর!
বড়'র জন্য হয় কমিশন মেজোর জন্য তদন্ত চল্
ছোট'র জন্য জেল-হাজত-বাস—ধরা পড়ার বিচার-ফল।

চোরের সমাজ টাকায় গড়া ধনীর গলায় ফুলের মালা,
গরীব হলে কেউ পোঁছে না, জীবন ভরা বাঁচার জ্বালা।
মূর্খ ধনী জ্ঞানীর পদে বাড়ায় শোভা ছড়ায় বাণী,
বিদ্যা-বুদ্ধি সকল মিছে—টানে গরীব ধনীর ঘানি!

আজও কুরুক্ষেত্র

এক

আজও খল কৃষ্ণেরা দেবত্বের লোভে
আড়ালে কলকাঠি নাড়ে—
শপথ ভাঙ্গে—
নির্বোধ গাণ্ডিবীর বোধোদয়ে
গীতার জন্ম দেয়
রক্ত বদলায় খুনি গড়ে
বারুদে উত্তাপ দেয় সর্বনাশ ডাকে
সম্মোহনী বিস্তার করে বিশ্বরূপে
সাদা পায়রার চোখ থেকে

নীল আকাশের স্বপ্ন কেড়ে নেয়
ডানা কেটে—
শান্তির সন্ধানে উড়তে গিয়ে
মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে সে,
যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে—
তার লাল রক্তে শোষিত হয়
ধর্ম্মক্ষেত্রের অভিষেক,
ঘুম ভাঙে কুরুক্ষেত্রের।

দুই

আজও অত্যাচারে ঝলসানো শকুনিরা
স্বজনের হাড়ে পাশা খেলে —
অক্ষম প্রতিহিংসায়
পাপের আগুনে ইন্ধন জোগায়—
স্ফুলিঙ্গে দাবানল গড়ে,
নিজে পোড়ে—মুখ পোড়ায় —
পোড়ায় সত্য-শিব-সুন্দর—
রাজা—রাজ্যপাট—
ভয়ঙ্কর থেকে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে দুর্যোধন,
ঘুম ভাঙে কুরুক্ষেত্রের।

তিন

আজও জুয়াড়ী যুধিষ্ঠির বাজি ধরে
দ্রৌপদীকে—
বধূ মাতা কন্যা পণ্য হয়—
অর্থখ্যাতি যশ রাজ্য-লোভ
মানুষকে করে পশু—
মূল্যবোধের অবক্ষয়ে ফাটল ধরে
শাশ্বত চেতনায়।
তারপর
একদিন তিলে তিলে অপমানের আক্রোশ

মহাপ্রলয়ের রূপ ধরে ছুটে আসে
জ্বালামুখ চিরে,
ঘুম ভাঙে কুরুক্ষেত্রের।

চার

আজও ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ চোখে ঠুলি বেঁধে,
পিতৃস্নেহে কালসাপ পোষে—
আত্মস্বার্থে, স্বজন পোষণে—
সত্যমিথ্যা—হিতাহিত—ন্যায়-অন্যায়ের
মুখে কালি মেখে এক করে
নিখুঁত শিল্পীর তুলি অন্ধ-দৃষ্টি টেনে।
ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের বাঁচার অধিকারে
রচিত হয় অত্যাচারী যুবরাজের
বাদশাহী নাগরার সুখতলা—
রাজপদ রাজসিংহাসন চড়ে নিলামে—
বিচারশালায় বসে জুয়ার আখড়া—
উলঙ্গ দ্রৌপদীর আর্তনাদে হাসে রাজসভা,
ঘুম ভাঙে কুরুক্ষেত্রের।

পাঁচ

আজও মূঢ় দ্রোণ কর্ণ কৃপ
মহারথী মহাধনুর্ধর বলি দেয় দেশপ্রেম
ভণ্ড রাজভক্তি যূপকাঠে—
দাসত্বের অহংকার কর্তব্যের গলা টিপে মারে-
অপমান অলংকার শোভে—গুণীজনে
তিরস্কার পুরস্কার মানে—পৌরুষ
অর্থলোভে—বিলাস-ব্যসনে—
ধিক্কৃত বীরত্ব শিরোপায়।
শ্রবণে বধির সব—
নর্তকীর নূপুর নিক্কণে,
মস্তিষ্ক বন্ধক পড়ে রাজকোষাগারে,

স্থবির ধমনী দেহে—সুরাবিষ পানে,
ক্ষমতার হাতে নাচে সব—
প্রাণহীন পুতুলের মত,
আশ্বাসে প্রশ্রয়ে সম্ভ্রমে সযত্নে পালে
ধ্বংসবীজ—প্রিয় দুর্যোধন।

নারীর সম্ভ্রম—দুর্বলের অধিকার—
বিচারের বাণী—
কাঁদে বনে বনে নির্বাসিত পাণ্ডবের চোখে।
স্পষ্টতর হয়ে আসে দেয়ালের লেখা—
অনিবার্য্য হয়ে ওঠে দুষ্কৃতি-বিনাশ,
ঘুম ভাঙে কুরুক্ষেত্রের।

ছয়

আজও দুষ্ট দুর্যোধন,
ভোগ করে রাজ-ঐশ্বর্য্য রাজপদ
দর্পে, ছলনায়—
ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র জাল বোনে,
চিরস্থায়ী সুখ-স্বপ্ন দেখে।
ন্যায়দণ্ড জ্বলে জতুগৃহে—
সত্য যায় বনবাসে—অশ্রুসিক্ত পথে
পাণ্ডবের সাথে।
মিথ্যা-রাজমুকুটের মণি,
কণ্ঠহারে চাটুকারি নক্ষত্র-মণ্ডল—
দুঃশাসন জয়দ্রথ অশ্বত্থামা
দ্রোণ কৃপ কর্ণ আদি—জ্বল জ্বল করে,
তদুপরি মাতুল শকুনি—কুমন্ত্রণা খনি—
দাবানলে ঘৃতাহুতি—সর্বনাশ.নেশা
কান্নার সমুদ্রে তোলে ঝড়,
দ্রৌপদীর মুক্তকেশে মুহুর্মুহু নেচে যায়
অশনি সংকেত.
ঘুম ভাঙে কুরুক্ষেত্রের।

কবিতা / অর্ঘ্যনারায়ণ বসু

সুখদুঃখের কবিতা

পাখীর কাছাকাছি গাছ আছে
তাই তার কোন দুঃখ নেই,
গাছের কাছাকাছি বৃষ্টি আছে
তাই গাছও শোকহীন।—
মানুষের কাছাকাছি মানুষ আছে ব'লে
তার কোন সুখ নেই—
সে নদীর নীলে প্রতিদিন পাপ মোছে
ক্লান্তি কিংবা স্মৃতি।—
এরকমই মানুষের কাছাকাছি পাখী নেই,
গাছ নেই বলে কোন সুখ নেই।

আগুনের পাখী

অন্ততঃ একটা প্রদীপ জ্বলুক
ঝরঝরে আলোয় কুটিল মানুষের ছায়া থেকে দূরে
এই অন্ধকারেও
খড়কুটোর বিশ্রাম ভুলে এভাবেই
একটানা উড়ে যায়—যাক্—
আগুনের পাখী—
বিশ্বাসের পালক ছড়িয়ে ছড়িয়ে···
অন্ততঃ একটা প্রদীপ জ্বলুক।

প্রার্থনা

একটি মানুষের কাছে আমি যাই—
হাঁটু মুড়ে বসি—
কথা বলি—
গৈরিক হাওয়া স্পর্শ করে আমার বুক
যেন কিসের সম্মোহনে
নিমেষেই ঝরে যায় দুঃখের বাসি ফুল। এভাবেই
সারাদিন শঙ্খ বাজে,—
সেই ধ্বনি আর মন্দিরের চাতাল জুড়ে সন্ধ্যে নামে
কখন পঞ্চপ্রদীপের আলোয়—
তার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি।

বৃত্ত

ফুলের সকাল বিকেল ফিরিয়ে দিয়ে
পাথরের বৃত্তের ভেতর
এই তো বেশ,—
বৃত্তের বাইরে যে যায় যাক্
প্রজাপতি ওড়ে উড়ুক—
কিছুতেই যাবো না নিজেকে ছেড়ে—কোথাও
ফুলের সকাল বিকেল ফিরিয়ে দিয়ে
পাথরের বৃত্তের ভেতর
এই তো বেশ,—
নির্বাসনের একটানা এসরাজ।

যে যার বৃত্তে একা

এ সময় আয়নায় যার মুখ তার মুখ
প্রিয় বন্ধু—
প্রিয় নারী কেউ কোথাও নেই
যে যার বৃত্তে একা
জেগে আছে নীল আলোর হিমে
সুখ, চিন্তা আর স্মৃতি নিয়ে।—
এভাবেই আজ শূন্যের ঘেরাটোপে রাংতায় মোড়া
এক একটা মানুষ
নিজেরই স্বপ্ন ঘিরে কি ভীষণ ব্যক্তিগত বোধ ও সত্তায়
যে যার বৃত্তে একা।

পরশপাথর

শঙ্খচূড় বিষ
কিংবা
ফণিমনসার ঝাড় সরিয়ে সরিয়ে
অতি দ্রুত সরে যায়
মানুষ —
ক্রমশঃ নিরাপদ ব্যূহে।—
এভাবেই তুলে আনে সে নিহিত সুখের ফুল
মানুষই জানে
প্রতিকূল হাওয়ার গতিবিধি। অন্ধকার ঘেঁটে
খুঁজে পায় আলোর পরশপাথর।

পিতৃহীন এক বালক

ফল্গু নদী।—
　　　　বিষ্ণুপাদ।—
অক্ষয় বটের মূলে প্রিয় ফল দান।—
এভাবেই—
মন্ত্র শেষে ফেরা তাঁর অশেষ স্মৃতিকোণে
ছায়া নামে দু' চোখের পাতায়,
তীর্থের ধুলো মেখে উঠে আসে পিতৃহীন এক বালক—
বালক জানে,
এখানেই শেষ নয় ফল্গু নদী।—
বিষ্ণুপাদ।—
কিংবা অক্ষয় বটের মূলে প্রিয় ফলের স্মৃতি।

ভিতরের মানুষ

নামমাত্র পাতা নেই
তবু—
মাটির গভীরে শিকড়ের শিরায় শিরায়
জীবনের কি তীব্র গন্ধ।
সে জানে
বোবা নদী। তারও খুব কাছ থেকে শোনে—
ভিতর স্রোতের শব্দ। এভাবেই—
তার বাধ্য নাগরিকের শীত-ঘুম ছিঁড়ে দ্যাখো,
কি ভীষণ ফণা।

অন্ধকার

কী ভীষণ অন্ধকার !

আমি আজ একা।

আমার চারপাশে আজ খাদের প্রাচীর।

আমার অস্থি, আমার মজ্জা, আমার অনুভূতি

আজ বিদ্রোহী।

তাদের উন্মত্ত চিৎকারে কেঁপে উঠছে আমার সারাৎসার।

আমি যেন ভেঙে ফেলতে চাইছি ঐ প্রাচীর,

লাফিয়ে উঠতে চাইছি পাহাড়ের চূড়ায়

বন্দী সৈনিক যেমন ভেঙে ফেলতে চায় তার

কারাগার—যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রে ওঠে চাপা আর্তনাদে।

আমার মুমূর্ষু ইচ্ছাগুলো আছড়ে পড়ে আজ দেওয়ালে।

ভেসে যায় আমার স্বপ্ন—আমার বিশ্বাস—আমার

আগামী।

হে নর, হে নারী,

তোমার নিঃশ্বাসে সহস্র বছরের অরণ্যঘ্রাণ।

তোমার চেতনায় রোমশ উল্লাস। জীবনের ফেনিল মত্ততা।

চাঁদের আলোয় বিভ্রান্তির মায়াজালে

অভিনয়ের কী প্রচেষ্টা !—কী ভীষণ প্রহসন !

নিজের কাছেই তুমি মুক্ত নও।

তোমার হাসিতে অদ্ভুত চাতুর্য—দৃষ্টিতে প্রহেলিকা—

ওষ্ঠাগ্রে মিথ্যা শব্দের দ্যোতনা।

কোথায় তোমার সত্যকার পরিচয় ?

তোমার মুক্ত নগ্ন হৃদয় ?

তোমার সর্বাঙ্গে আজ বিবর্ণ অসুখ—বহু শতাব্দীর গ্লানি।

হায়, প্রগতি !   তুমি আজ মৃত।
এ তোমার প্রেতাত্মা—তোমার কঙ্কাল।
অনেক অনেক যুগ আগে ফেলে এসেছ
তোমার জীবন—তোমার স্পষ্টতা—তোমার ঋজুতা।

আর, কী নির্বোধ আমি !
হৃদয়ের অবিরল মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে
ডুবিয়ে ফেলে পবিত্রতার চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে
চেয়েছি আমার অবয়ব।
—আমার অপূর্ব একটা মূর্তি।
কোথায় গেল আমার সেই প্রত্যয় ?
আজ রক্তাক্ত বুকখানাকে দু'হাতে চেপে ধ'রে
লাফিয়ে উঠতে চাইছি চূড়ায়।
সর্বাঙ্গে ক্লেদ গ্লানি পরাজয়ের অভিশাপ।

ও আমার মাটি, আমার ভালোবাসার মাটি,
প্রথম চোখ মেলেই দেখেছি তোমায়।
তোমার বুকেই বুক ঘ'সে অনুভব করেছি
জীবনের স্পন্দন—ভালোবাসার অনুভূতি।
আমার অস্থি, আমার মজ্জা, আমার দেহের অণু-পরমাণু
সবই তোমার।
আমি জন্ম নিতে চাই তোমারই কোলে।
জীবনের গভীর ঘুম থেকে উঠে বিষাক্ত নিঃশ্বাস থেকে দূরে
বহুদূরে প্রান্তরের পর প্রান্তর পেরিয়ে নির্বোধ হরিণের মত
ছুটে যেতে চাই জীবনের সন্ধানে।
স্পন্দন—শব্দ—গতি।
স্থির জলে চেয়ে দেখতে চাই আমার মুখ—বোবা দৃষ্টি
মেলে চেয়ে দেখতে চাই তোমার সৌন্দর্য।

বাঁচার অধিকার

দুঃখ-দারিদ্র-জর্জরিত মুমূর্ষু জীবন।
প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তেই সংগ্রাম।—
জীবনের বিরাট সংগ্রাম।
ক্লান্ত অবসন্ন দেহমন।
সর্বাঙ্গে অবসাদ।
কি হবে, কি হবে এই বেঁচে থেকে ?
মৃত্যু কিম্বা আত্মঘাতই কি শ্রেয় নয় ?
—ভাবতে ভাবতে কখন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ি।
ভুলে যাই সমস্ত জগৎ, স্বকীয় সত্তা,
সামনে পিছনে সবকিছু।

'বাবা ?'—হঠাৎ চমকে উঠি।
মুহূর্তে সম্বিৎ ফিরে পাই।
চেয়ে দেখি সন্তানের কচি মুখখানা।
সরল নিষ্পাপ শিশু—
শ্বেত শুভ্র পদ্মের মত।
প্রত্যাশায় পরম নির্ভর।
সহসা জীবনটা যেন ভালো লাগে।
সবকিছুই সুন্দর ব'লে প্রতিভাত হয়।
মনে মনে বলি ঃ ওরে অবোধ, আমাকে যে বাঁচতেই হবে।
বাঁচতেই হবে অনেক—অনেকগুলো বছর।—
সংগ্রামী বছর।
বুকে হেঁটেও সঞ্চয় করতে হবে
তোদের ক্ষুধার অন্ন, বাঁচার অধিকার।

একদিন যেতেই হবে

পৃথিবী, তোমায় ছেড়ে একদিন যেতেই হবে।
এই আকাশ, এই বাতাস, স্বপ্নময় রাত্রি,
সুদূর দিগন্তরেখা, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, নদীর কলতান,
শুভ্র তুষার ঢাকা পর্বত, পলাশ-শিমুল-কৃষ্ণচূড়ার
বনে বনে মিশে যাওয়া গোধূলির রক্তিম আলো,
বর্ষার মেঘে মেঘে রামধনু রঙ!—সব পড়ে থাকবে।
সব পড়ে থাকবে পিছনে। পড়ে থাকবে
অনেক অনেক স্বপ্ন—মায়ার বন্ধন!
এতো দুঃখ, এতো জ্বালা, এতো দ্বন্দ্ব, হানাহানি—তবু
মন তো যেতে চায় না! তুমি যে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে
ছড়িয়ে রেখেছ মায়ার আবেশ! সে বন্ধন ছিন্ন করা
কী সহজ? কী এক অজানা ইঙ্গিতে,
প্রচণ্ড দুর্নিবার মোহে আমরা যেন এগিয়ে চলেছি····

পৃথিবী, তোমায় ছেড়ে যেতেই হবে।
জানি, তুমি ভুলে যাবে। সমস্ত স্বপ্ন হারিয়ে
যাবে একদিন। এই 'আমি' হারিয়ে যাবো সহস্র
'আমি'র মধ্যে। এই মুহূর্তগুলো হারিয়ে যাবে
অনেক মুহূর্তের মধ্যে। 'কী রেখে গেলাম, কী দিয়ে
গেলাম, কার সাথে কতটুকু সম্বন্ধ, ভালবাসার
গভীরতা'—কিছুই চিনতে পারবো না যদি ফিরে
আসি কোনোদিন। তবু রেখে যেতে চাই!
রেখে যেতে চাই কিছু না কিছু ছাপ তোমার বুকে
আমাদের অস্তিত্ব আর ভালবাসার সাক্ষীস্বরূপ!

পৃথিবী, জানি তুমি হাতছানি দিয়ে ডাকবে।
বারবার, সহস্রবার! সে ডাক কোনোদিন
ভোলা কি সম্ভব?—আত্মার প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে
তারই আবেশবিহ্বল সুরের মূর্ছনা!

আলোতে অরণ্য এক

ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠা নয়, নয় যশ, নয় কিছু নয়,
শুধুই আনত চোখ—নম্র ভাষা—প্রত্যাশা আমার ;
হয় ত' সবাই চায়, শুধু এই, আমার প্রত্যয়,
সযত্নে লালন ক'রে কে-বা চায় বিরূপ আচার ?

কে-বা চায় ক্ষিপ্ত ঝড় পরিচ্ছন্ন নির্মল আকাশে ?
কে-বা চায় স্বপ্ন-রথ অহর্নিশ নেয় অন্য বাঁক !
সবাই ত' শান্তি চায়—শান্তি গেলে দূরে পরবাসে
চলন্ত জীবন মাঝে জীবনের অন্য মৃত্যু এক।

দু'চোখে জমাট বাঁধে পৃথিবীর যত আছে কালো ;
আলোতে অরণ্য এক—ঢেকে দেয় সবটুকু আলো।

এগিয়ে চলেছে

এগিয়ে চলেছে প্রগতি···
মুমূর্ষু পৃথিবীটা অস্বাভাবিকতার অসুখে ধুঁকছে।
রূঢ় বাস্তবতায় বিবেকের পারদটা প্রায় স্থির।
বিভ্রান্ত অনুভূতিগুলো।
বাতাসে অসংখ্য ধূলিকণা, সহস্র কোটি জীবাণু,
বিষাক্ত গ্যাস আর আলোক-রশ্মি।
পৃথিবীর বায়ুস্তরে ওজন গ্যাসটা দুর্লভ,
অক্সিজেনেরও পরিণতি তাই।
জিঘাংসা চরিতার্থতায় পৃথিবী আত্মহারা।
একদিন হবে আত্মঘাতী।
সেদিন কে জবাব দেবে, প্রকৃতি—না মানুষ ?
প্রাণচিহ্নহীন ঊষরতা অনন্তকাল শুধু সাক্ষ্য
হয়ে প'ড়ে থাকবে এই গ্রহটায়।

প্রহসন

যে জন হারিয়ে পথ কেঁদে কেঁদে সারা,
ছিন্নভিন্ন ক্লান্ত স্নায়ু—চঞ্চল অস্থির ;
কি ক'রে চলবে তার জীবনের ধারা ?
—সময়ের জরায়ুতে সে এক স্থবির।

অথচ চলতে হয়, গতি গতিহীন,
অথচ বলতে হয় অহেতু সংলাপ ;
জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যয়বিহীন
রঙমাখা এই দেহ যেন নিরুত্তাপ।

সব মিথ্যা প্রহসন, ঘাস মাটি জল —
মিথ্যার লাঙলে ফলে মিথ্যার ফসল।

অবক্ষয়

সভ্যতার দৃশ্যপটে যৌনতার জঘন্য প্রয়াস
সমাচ্ছন্ন বাধাহীন—উদ্ধত উদ্দাম।
বিকৃত উদগ্র ক্ষুধা মনুষত্ব বিবেক-দংশন
নির্বিচারে হত্যা করে—ভ'রে দেয় পঙ্কিল কামনা।
পথেঘাটে জনারণ্যে কাব্যে গানে সিনেমা পোষ্টারে
সাহিত্যে প্রচারপত্রে অন্তর্ঘাতী সমাজের ক্ষত।
কচি কচি মাথাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে
এখনও মেটে না আশা ?—কতটুকু আছে আর বাকী ?
এ যদি সভ্যতা হয়, এই যদি প্রগতির আলো !—
আদিম অরণ্যযুগ এর চেয়ে ছিল না কী ভালো ?

এখনো

এখনো মানুষ আছে, মনুষ্যত্ব আছে তো কিছুটা,
না হ'লে পৃথিবী আজ যেত রসাতলে ;
নিছক প্রগতি চোখে, দ্যাখে না পিছুটা,
বিচরণ অন্তরীক্ষে গ্রহে জলে স্থলে।

এখনো রয়েছে প্রেম নিষ্ঠা নীতি ভয়,
এখনো মায়ের প্রাণ কেঁদে কেঁদে ফেরে ;
এখনো ঐশ্বর্য ছেড়ে নিঃস্ব কত হয়,
এখনো প্রিয়ার চোখ অশ্রুজলে ঘেরে।

হয়তো হাজার সাল, হয়তো হবে না,
তবুও জিজ্ঞাসা জাগে, কী হবে আগামী ?
পবিত্র পৃথিবী চাই ?—নিষ্ঠায় তবে না !
এসো না পৃথিবী গড়ি আজ তুমি আমি।

খুলে ফেল রুদ্ধ কপাট

ওই যে পাহাড়—বন— সুনীল আকাশ,
এই যে সবুজ ক্ষেত—দুরন্ত সাগর,
আগেও যেমন ছিল আজও আছে তাই ;
—এরই বুকে চলে গেছে কত না বছর !
ভাবো দেখি অহঙ্কারী, আদিম সে জন—
তুমি তার বংশধর, একই শরীর ;
তার প্রতি কোষে কোষে ধমনী শিরায়
প্রবাহিত হ'ত না কী একই রুধির ?
মানুষ—মানুষ ছিল, ছিল তার প্রেম,
মাঝখানে ছিলো নাকো কোনোই প্রভেদ ;
স্বার্থের কুটিলচক্র পবিত্র হৃদয়ে
ভ'রে দিল যত ঘৃণা—ক্লেদ।
ওই যে চণ্ডাল দূরে—তোমারই ফসল ;
শোনো তার বুকের স্পন্দন।
ভাবো কেন, ঘৃণা হয় ?—চোখে চোখ রাখো,
দেখ না কী একই হাসি—একই ক্রন্দন ?
একই ক্ষুধা, একই সাধ, একই কল্পনা,
একই ব্যথা, একই গান ও-হৃদয়ে আছে ;

তোমাদের সৃষ্ট ওরা, পুঞ্জিত ঘৃণায়
চেয়ে দেখ ছেয়ে আছে আনাচেকানাচে।
দু'চোখ বন্ধ ক'রে দাঁড়াও নিশীথে ;
স্পর্শ করো জমাট আঁধার।
বলো দেখি, পাও কিছু ?—কিছুই পেলে না ?
সব ফাঁকা ?—সবই অসার ?
এবার স্পর্শ করো দু'চার শরীর,
নগ্নদেহে দাঁড়াক ওখানে ;
একে একে বলো দেখি কার কোন্ জাত
খুঁজে পাও গায়ে কোন্‌খানে ?
তুমি আমি ওর মাঝে তবে কী তফাৎ ?
কেন মিথ্যা অহমিকা ?—দুস্তর প্রভেদ ?
অনেক আঘাত খেয়ে জেগেছে চেতনা—
ওরাই এ নাটকের টেনে দেবে ছেদ।
খুলে ফেল অবিশ্বাসী রুদ্ধ কপাট—
সংস্কার আচ্ছন্ন যত খিল ;
ঝেড়ে ফেল বহুযুগ সযত্নে রক্ষিত
ক্লেদমাখা পুঞ্জিত ফসিল।

বড়বাবু

বড়বাবু হ'য়ে কাবু গরমের চোটে
ক্ষণে ক্ষণে অকারণে রেগেমেগে ওঠে।
এ-কে ডাকে ও-কে হাঁকে, সপ্তমে গলা ;
কাজ চাই—ক্ষমা নাই, নিয়মেতে চলা।
রাগী ব'লে সকলে শিরে দেয় হাত :
তাঁর এই কলমেই যায় বুঝি ভাত !
চাপরাসী বিধু কাশী সাবধানে থাকে,
সুশীতল ভাল জল কুঁজো ক'রে রাখে।
ক'টা খান বিড়ি পান নেই তার খাতা ;
রাগী হোক—ভাল লোক, ভেবো নাক' যা-তা !

পথ

পথ।
পায়ে চলা মেঠো পথ।
গান গেয়ে গেয়ে কৃষকের চলা পথ!
শান্ত, স্নিগ্ধ, তরুছায়াঘেরা পথ।

তারই একপাশে শান্ত একটি গৃহ,—
প্রেয়সী আমার নীরবে রয়েছে সেথা।
কোথায় সে পথ, কোথা হ'তে কোথা গেছে,
কোথায় সে গৃহ? —জানি না এ-কথা আজ।
এই শুধু জানি, প্রতিটি ধূলায় সেথা
আমার মনের স্পর্শ জড়ায়ে আছে।
সেথা হ'তে ঐ কে যেন নীরবে ডাকে,
কে যেন আমায় কেঁদে কেঁদে শুধু কয়,—
'হে পথিক! তুমি আজো তো এলে না হেথা?
প্রেয়সী তোমার চেয়ে আছে পথ পানে!'

পথ!
পায়ে চলা মেঠো পথ।
গান গেয়ে গেয়ে কৃষকের চলা পথ।
শান্ত, স্নিগ্ধ, তরুছায়াঘেরা পথ!

ট্রেনের ভিড়ে বাসের ভিড়ে

ট্রেনের ভিড়ে বাসের ভিড়ে
বেঁটের বিপদ ভাইরে!
বুকে-পিঠেই মুখটা চাপে
বাতাস কোথা পাইরে?
ঝোলাচ্ছি রিং গাছের ডালে,
স্কিপিং করি সাতসকালে,
ব্যায়াম ক'রে বাড়তে পারি
উপায় খুঁজি তাইরে!!

তোমার মনটা কী আচ্ছন্ন ?

বন্ধু, ভালবাসা অর্থাৎ প্রেমের আবর্তে তোমার মনটা কী আচ্ছন্ন ?
তুমি কী ভাবো তোমার জন্যে তোমার প্রিয়তমা
জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে ?
হয়তো পারে ; তবে তখনকার সেই 'তুমি'-র জন্যে।
একটা সেন্টিমেন্ট বা দুরন্ত ভাবাবেগবশতঃ।
তুমি যদি অন্য 'তুমি'-তে পরিণত হও ?
তোমার সুন্দর চেহারাটা ঝ'রে গেছে, দু'চোখে ক্লান্তির ছাপ,
মুখে নেই ঔজ্জ্বল্য, তুমি যেন একটা ছায়ামাত্র—অর্ধকংকাল।
কিংবা ঘটেছে অঙ্গহানি—বিকৃত হয়েছে মুখখানা।
তুমি হয়ে গেছ নিঃসহায়, নিঃসম্বল। জীবনযুদ্ধে পরাজিত।
কী ভাবছো ?
তোমার দুঃখে কাতর হয়ে থাকবে চিরদিন, তাই না ?
প্রতিনিয়ত ঝ'রে পড়বে দু'চোখ থেকে সহানুভূতির ঝর্ণাধারা ?
সত্যই তুমি আহাম্মক।
বুদ্ধিমত্তার কোটিনে তুমি একটা নিরেট বোকা।
হয়তো জীবনের নাট্যমঞ্চে কিছুটা অভিনয় দেখতে পাবে, তবে কতক্ষণ ?
মনটা যদি দেখতে পেতে, দেখতে টিয়াপাখি মনটা কখন উড়ে
গেছে কিংবা উড়ে যেতে চাইছে—ব'সতে চাইছে অন্য কোথাও।
অবশ্য পাখা দুটো যদি ভারী না হ'য়ে থাকে।

প্রেম—ভালবাসা ?
একটা নিছক প্রহেলিকা—একটা দুর্নিবার মোহ।
দুটো জীবনের একটা সেতুবন্ধ—একটা অবলম্বন বেঁচে থাকার।
তোমার চোখেমুখে প্রজাপতির রঙ, সর্বাঙ্গে নদীর উচ্ছলতা,
কী প্রয়োজন মনটার ?
তোমার মনটা কী কেউ দেখবে ?—কেউ বুঝবে ?
বুঝবে কী তোমার মনের অফুরন্ত সৌন্দর্য—সাগরের গভীরতা ?

স্মৃতি পিছু ডাকে

শঙ্কিত হৃদয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছি।
পা আর চলে না। তবুও চলা।
দেহটাকে যেন কোনোরকমে টেনে নিয়ে যাওয়া।
একমাত্র উদ্দেশ্য পথটাকে ছোটো ক'রে নেওয়া।

মেঠো পথ। —লাল কাঁকুরে মাটি।
অশান্ত দোলায় চঞ্চল মনটা শুধু ছুঁয়ে থাকে
ময়ূরাক্ষীর ধার ঘেঁসে সেই বাড়ীটাকে।
গাছের ছায়ায় ছায়ায় স্বপ্নময় স্মৃতিমাখা বাড়ীটাকে।

এগিয়ে চলেছি। —শরতের সকাল। স্বচ্ছ আকাশ।
—ডাইনে-বাঁয়ে ধানক্ষেত।
অন্য সময়ে আকাশের বুকে উড়ে চলতো বলাকা মন।
স্পর্শ করতে চাইতো সুদূরে দিগন্তে স্বপ্নরঙিন কল্পনাকে।
স্পর্শ করতে চাইতো বাতাসের দোলায় দোলায়
ধানের সবুজ শিষগুলোর ছোঁয়ালাগা শিশির ভেজা
মাটির বুকে সবুজ গালিচাকে।

এসে পড়েছি। —নদীর তীর।
সরু একফালি জল সরীসৃপের মত এঁকেবেঁকে চলেছে।
—বালি আর বালি।
উঁচু নিচু বালির ওপর দিয়ে কোণাকুণি এগিয়ে চলেছি।
সহজ একটা সরলরেখা যেন তাড়াতাড়ি ছুঁতে চাইছে বাড়ীটাকে।
এলাম। তারপর?

সব শেষ!
আর কোনোদিন খুঁজে পাবো না। —কোনোদিনও না।
কোথাও না।
খুঁজে পাবো না সেই গাঢ় চোখের স্তব্ধ ভালবাসা—
অন্তহীন মমতা।
নদীর বুকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে সমস্ত চাওয়া আর
পাওয়াকে মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে!

সূর্যটা ধীরে ধীরে ঢলে পড়তে থাকে পশ্চিম দিগন্তে।
অশান্ত আবেগে অবশ দেহটাকে টেনে নিয়ে যাই
শ্মশানের নির্দিষ্ট জায়গায়।
ধু-ধু বালি। সর্বত্র নিস্তব্ধতা।
নদীর দু'ধারে শরগাছগুলো শুধু একটা জমাট বেড়ার
সৃষ্টি ক'রে রেখেছে।
দেবদারু-বট-অশ্বত্থ-ঝাউ-শিরিষের পাতার শির্‌শির্‌ আওয়াজ।
সোঁ সোঁ বাতাসের শব্দ।
জীবনটার প্রতি কী যেন এক ইঙ্গিত—কী যেন এক জিজ্ঞাসা।
ময়ূরাক্ষীর ধার ঘেঁসে বাতাসে বাতাসে যেন শুনতে পেলাম
সেই কথাটা— কোনো এক সময় হঠাৎ বাড়ী গিয়ে পড়ায়
হাস্যোজ্জ্বল মুখের অফুরন্ত আবেশমাখা গাঢ় সেই কথাটা—
'শু-ন-ছো ?—দ্যাখো, কে এসেছে !' সেই শব্দটা যেন শুনতে
পাচ্ছি হৃদয়ের গভীরে গভীরে—পিতৃস্নেহে সিঞ্চিত
শব্দসম্ভারে—শুনতে পাচ্ছি ময়ূরাক্ষীর ধারে ধারে—
দেবদারু-বট-অশ্বত্থ-ঝাউ-শিরিষের ফাঁকে ফাঁকে।

পথে যেতে যেতে

দিবস-অন্তে দূরে দিগন্তে অরুণ অস্তগামী,—
আধো-আলোছায় স্বপ্নমায়ায় সন্ধ্যা আসিছে নামি'।
হেনকালে যবে সৌখিন বেশে
চল্‌তেছিলেম মধুর আবেশে
ছোট এক ছেলে কহে সবে এসে, 'চানাচুর বাবু চাই ?'
জানালেম তারে ক্ষীণ রোষভারে, 'প্রয়োজন মোর নাই।'

তবু দেখি সেই, ভ্রূক্ষেপ নেই, বালকটি পিছু পিছু
আসিতে আসিতে কহিল নিভৃতে, 'নিন্‌ বাবু আজ কিছু,
বাবার অসুখে কয়দিন ধ'রে
ট্রেনে ট্রেনে ফিরি পয়সার তরে,
আজ যেতে বাবু বড় ভয় করে, কে যেন পড়েছে চাপা।'
তার সেই কথা সেই সরলতা সহজ সত্যে মাপা।

সহসা সেদিন, আমি অতি হীন, উপকার হয় যাতে—
মানিব্যাগ খুলি' একটি আধুলি দিলেম তাহার হাতে।
আশা-আনন্দ-কৃতজ্ঞতায়
কয়েক প্যাকেট সবে দিতে যায়,
হেনকালে কহি বাধা দিয়া তায়, 'পয়সাটা দিনু তোরে।'
কহিল ছেলেটি, 'নিন্ বাবু এটি, বাবা বকিবেন মোরে।'

আমার সে দান তায় অপমান সে আমি কেমনে সহি!
'বড় সাধুগিরি, করিস্ তো ফিরি!'—সরোষে তাহারে কহি।
সভয়ে সেদিন সরল সে প্রাণ
লয়েছে আমার করুণার দান,
এ-দয়া শুধুই ঘৃণা-অপমান, সেদিন কী আমি জানি?
আজ দারিদ্র্য করেনি ক্ষুদ্র, দিয়াছে বিবেক আনি'।

হে আমার প্রভাত, আমার সোনামাখা দিনগুলো

হারালো কোথায় আজ সোনামাখা দিনগুলো, হারালো কোথায়?
পিছনের পানে চাই স্মৃতিগুলো খুঁজে পাই, ভ'রে ওঠে মন বেদনায়!
আমার প্রথম সূর্য—প্রভাতের সেই সূর্য দেয় নাকো আজ সেই আলো!
জ্যোৎস্নাময়ী সেই চাঁদ রচে নাকো কল্পলোক—যাকে কত বেসেছি যে ভালো!
আগেও যেমন ছিল আজও আছে সেই পথ ঝোপঝাড়—কূজন কাকলি,
সেই নদী জলাশয় সবই আছে, প্রাণ নাই, এ-কথা বা কাহারে যে বলি!
জানিনা কেমন ক'রে কোথায় হারায়ে গেল কল্পনার রথ দ্রুতগামী,—
বাস্তবের মুখোমুখি জানি না কখন এসে চোখ মেলে দাঁড়ালাম আমি!
সেদিনের 'সেই আমি', শুচিশুভ্র 'সেই আমি' কোথা আজ?—আজ অন্যজনা;
স্বার্থের সংঘাতে আজ কেঁদে ওঠে স্মৃতিগুলো, বেদনায় করে আনাগোনা।
আঁধারে আঁধারে খুঁজি, বাঝি না, কতই বুঝি (!), করি শুধু বুঝিবার ভান;
জীবনের রঙ্গমঞ্চে করি মিথ্যা আলাপন, যাহা বলি নাই কোনো প্রাণ!
সম্মুখে কর্তব্য শুধু, হোক্ মরু বালি ধু-ধু, তবুও চলেছি পথ বেয়ে;
জানি না কোথায় থামা, কখন কোথায় নামা, আত্মতুষ্টি কতটুকু চেয়ে!
সবই আছে, তবু নেই, থেকেও কিছুই নেই, এ থাকার কী বা আছে দাম?
আসলে হৃদয় নেই, আছি তবু যেন নেই, যেন এক ছিঁড়ে ফেলা খাম!

শীতকাতুরে শশীবাবু

শীতকাতুরে শশীবাবুর শীতটা লাগে কখন বেশি ?
কখন কমে সঙ্কোচনে শীতের ভয়ে মাংসপেশি ?
টিভি-র সেটে যখন দ্যাখেন নিম্নমুখী তাপমাত্রা,
ঝড়-ঝঞ্ঝা তুষার পতন, বাতিল কোথাও ট্রেন-যাত্রা ;
কিংবা কোথাও হিম-প্রবাহে মরলো মানুষ চরম শীতে,
শশীবাবুর হৃদ্‌কম্প—ধাক্কা লাগে বুকের ভিতে।

শীতটা বেশি লাগবে যে তাঁর ভাবনা সেটা এমন কি আর ?
কোট-সোয়েটার শাল-আলোয়ান গরম জামা হচ্ছে পাহাড় !
ডবল বোনা বাঁদর টুপি, হাত ও পায়ের পশম মোজা,
আপন মনে বলেন তিনি, ন' ডিগ্রী শীতটা সোজা ?
হি-হি হু-হু গা ম্যাজম্যাজ, অফিস কামাই করেন পাছে—
স্নানের সময় গরম জলটা না দিয়ে কি উপায় আছে ?
গিন্নী বলেন, আর দেখিনি তোমার মতন মানুষ দুটি,
কোনোদিনই হয় না যাওয়া জম্মু তাওয়াই শিলং উটি।

প্রশ্ন সবাই করতে পারে, শীতকাতুরে এমন যিনি—
নিশ্চয়ই বাসেন ভালো গরমকালটা বেজায় তিনি !
গরমকালে গেলাম গেলাম— ভীষণ গরম, বাঁচবো না আর !
যা ক'রে হোক কিনতে হবে এই গরমে এয়ার-কুলার !
যুক্তি দিয়ে বলেন তিনি, কোথায়-বা গাছ পুকুর ডোবা ?
পাল্টে গ্যাছে এই প্রকৃতি ! বন্ধু বলেন, তোবা, তোবা !!

বুড়ো গরু

বুড়ো গরু দুধ দেয় না, খাচ্ছে আগেভাগে।
গয়লা ভাবে, পয়লা কথা ময়লা সরাও আগে।
দু' চোখে তার পড়ল ছানি, ঘরেই রেখে টানাটানি,
বললে কিছু মারছে গুঁতো, গা জ্বলে যায় রাগে।

আলট্রা-ভোজ

আলট্রা মডার্ন সব—বিরিয়ানি রোস্ট,
সুইট্ কাবাব রোল ফ্রাই এগ্-টোস্ট !
আরো কত হেন তেন—কত কি যে নাম,
সব মনে রাখতেই ছুটে যাবে ঘাম !
সাজানো টেবিলে ফুল—সব ফিট্ফাট্ ;
গোলাপের কুঁড়ি দেয়, দেয় মেনু-চার্ট।
মিস্টার মিসেসের শুধু ছড়াছড়ি ;
খাওয়া-দাওয়া রেস্ট্রিক্ট—বড় কড়াকড়ি।
মিস্টার বাসু বলে, 'মিসেস্ জালান
কিছুই খেলেন না তো ? —সন্দেশ খান !'
মিসেস্ জালান বলে, 'ডক্টর ড্যাট্
জানেন তো রেগে যান—বেড়ে গেছে ফ্যাট্ ।'
ক্যাটারার এটা চায়—লাভ দ্যাখে তার ;
পেপ্টিক গ্যাসটিক্—হোক্ না প্রেসার !
কাকে বেশি দিতে হবে কোথা কোন্খানে
ব্যাচ দেখে ক্যাটারার বেশ এটা জানে।
স্ট্যাটাস্ মানে না কোনো—বৃথা এটিকেট্
এদের নিয়েই তার ফেলা আছে রেট !

দূষণ

শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ,
দূষণ হরেক রকম ;
ধর্মে দূষণ, কর্মে দূষণ,
হাজার রকমসকম !
গঙ্গাজলে দূষণ চলে,
হৃদয় গলে কথার ছলে,
মানুষ নামের রঙ্গশালায়
হচ্ছে মানুষ জখম !!

একি শুধু বইমেলা ?

বইমেলা, বইমেলা, নানা বই সম্ভার
রঙচঙে মলাটের ঝকঝকে কি বাহার !
কোন্ বই; কত দাম ? সামাজিক, বিজ্ঞান
নাকি দেশভ্রমণের, সৌরের দিকজ্ঞান ?

ধর্মের, কর্মের, কারিগরি বিদ্যার
নাকি স্মৃতিগ্রন্থ, নানা ভাষা শিক্ষার ?
কাব্যের, ম্যাজিকের, উলবোনা, রান্নার
জ্যোতিষীর মতামত, হীরে-চুনি-পান্নার ?

নাকি জুডো-ক্যারাটের, ব্যায়ামের কৌশল
ডাক্তারি-কবিরাজি, খেলাধুলো-ফুটবল ?
রূপকথা কাহিনীর বই দেশ-বিদেশের
পশুপাখি পালনের, অঙ্কের হিসেবের ?

প্লাস্টিক বই চাই ? ছবি-ছড়া মজাদার
সঙ্গীত-স্বরলিপি, ভূতপ্রেত সমাচার !
এ কি শুধু বইমেলা ? হৃদয়ের মেলা এই
বিশ্বের কলতান ভরা এই মেলাতেই !!

বিরাটীর বিধু বাগ

বিরাটীর বিধু বাগ ফাউ নিতে সিদ্ধ ;
টাকায়ালা—কর্মঠ—খোলামেলা—হৃদ্য।
যা-ই কেনে কচুঘেঁচু শাক-মুলো সজ্জা,
ফাউ তার নেওয়া চাই—নেই তাতে লজ্জা।
আট আনার সিঙারায় ফাউ ছিল সেকালে ;
সবকিছু পুরোপুরি পালটাবে একালে ?
ফাউ নেই এটা ওটা ধুতি জুতো জামাতে ;
তাতে কিছু এসে যায় ?—পুরো দেবো কামাতে ?

ক'ষে ক'ষে দর করো, ঠিক দেবে দোকানি ;
দ্যাখো দেখি ডাকে কিনা, এসো এই মোকা নি'।
একদিন পোস্তায় আলু খুব সস্তা,
বিধু বাগ নিয়ে যায় আলু পাঁচ বস্তা।
ঠেলা ভাড়া, ট্রেন ভাড়া, কত গেল খরচা ?
নেই তাতে মাথাব্যথা—হিসাবের কড়চা।
কলকাতা চায করে—পথে অলিগলিতে,
'চিপ্ রেট্'-এ বেশ কিছু পাবে তার থলিতে।
কম দর, 'গিফ্‌ট্', 'ফ্রী,' দেয় কেউ 'ছাড়' কি ?
শুনলেই ছুটে যায়—এই রোগ আর কি !!

লালবিহারী সমাদ্দার

লখ্‌নো থেকে লাওস হয়ে লাল'দা গেলেন লণ্ডনে ;
কুইটো থেকে কায়রো হয়ে কাবুল ঘুরে যান্ বনে।
লাহোর থেকে লেবাননে, মালটা হয়ে মরিসাস ;
পেরু থেকে পোল্যাণ্ড হয়ে পোর্টুগাল ও দামাস্কাস।
সৌদি-আরব সান্টিয়াগো নিকোসিয়া জাকার্তা—
যেখানেতেই লাল'দা নামেন হিসাব রাখেন টাকার তা !
কোথায় ডিনার ডলার রুবল, কোথায় ইয়েন পাউণ্ড-পেন্স ;
ঘড়ির কাঁটা ঘুরবে কোথায় সেটাও তিনি রাখেন সেন্স।
রাত্রে চেপেও কয়দিনেতে হয় না দ্যাখেন রাত্রি শেষ,
দিনে চেপেও লাল'দা দ্যাখেন যায় না মুছে দিনের রেশ।
বিশটা ভাষায় তুখোড় তিনি, সঙ্গে রাখেন নকশা চার্ট ;
হরেক রকম পোশাক-আশাক, চলায়-বলায় বেজায় স্মার্ট !
কোথাও নেমে শীতে কাঁপেন, খান যে তিনি গরম চা,
মন কোথা চায় লস্যি খেতে, লঙ্কা-নুনে করম্‌চা।
মস্ত জ্ঞানী ধনী মানী লালবিহারী সমাদ্দার ;
প্লেনেই ঘোরেন, ট্যুরিস্ট তিনি, নেই পরোয়া জীবনটার।

জীবনটা মামুলি

বাড়ীতে অসুস্থ সব প্রমোশন হচ্ছে না অফিসে,
তবু পথে মুখোমুখি বন্ধুদের নির্দ্বিধায় 'ভালো আছি' বলি—
নিত্যদিন ভোরে ওঠা দুষ্ট বাতরুণ্ট পায়ে তাড়াহুড়ো,
স্নান খাওয়া, ট্রেন ধরা, তাসফাস, জীবনটা মামুলি—
মনে তো অজস্র তাড়া এই ধরো—কর্মহীন ছেলেটার
যদি কোনো হিল্লে হয় ধরে করে এদিকে সেদিকে ;
মেয়েটা বয়স পার হয়ে গেলো তবু তার সুপাত্রস্থ
কই হলো, দিনরাত ছুটোছুটি করে চতুর্দিকে !
বিদায়নীতির বলি প্রতিবেশী ভোলাবাবু সদ্য গতকাল
আহাম্মক আমলাদের সীমাহীন অত্যাচার প্রতিটি অফিসে,
দুর্নীতির মূল পাণ্ডা সর্বত্র লাফাচ্ছে রোজ
চিৎকারে ফাটাচ্ছে গলা—'দুর্নীতি উচ্ছেদ হবে কিসে।'
এখন প্রায়শঃ পথে ছোট বড় জমায়েত, ক্রমশঃ ক্রমশঃ দিন
ভীষণ ঘোরালো হচ্ছে, পেরুচ্ছি যে কঠিন সময়,
মিছিলে সামিল কণ্ঠে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন
ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা মেহনতে আমাদের সুনিশ্চিত জয় ;
হাজারো ঝামেলা ঘাড়ে অসুস্থ শরীর তবু—
কারো সাথে দেখা হলে অসংকোচে 'ভালো আছি' বলি,
ঝড়-ঝঞ্ঝা বৃষ্টি রোদ জলোচ্ছ্বাস ভূমিকম্পে যুদ্ধমান—
নির্বাক নদীর মতো আমাদের বৈচিত্র্য জীবনটা মামুলি।

আধুনিক আয়ুর্বেদ

সততাকে মুড়ে এক পুরিয়া করেছি—
এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ টোট্‌কা ওষুধ ;
সেবনে ঝিমুনি বাড়ে উত্তেজনা কমে—
আত্মহননের ইচ্ছা প্রশমিত হয়।

কব্‌রেজি চিকিৎসা মতে চরিত্রের রোগ—
টোটকা ওষুধের গুণে ভালো হতে পারে,
কেউ যদি বাড়ী চায় গাড়ী চায় কেউ—
ঘরে গিন্নী 'বার'এ বোন অভাব হবে না।

সততা এমনই এক সৃষ্টি মানুষের—
কেউ তার কাঁধে চড়ে কেউ বুকে নাচে।
সব সয় সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো—
মাঝে মাঝে অল্প সল্প সর্দ্দিজ্বর হয়।

টোটকা ওষুধের গুণ ব্যাপ্ত চতুর্দিকে—
মিটি মিটি হাসে বৃক্ষে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী।

ইটখোলাকে

তোমায় বলি ইটখোলা—
ইটের চেয়েও নীরস তুমি
নয়তো মোটেই মনখোলা,
চিমনী দিয়ে উঠছে ধোঁয়া
হাজার লোকের জীবন ধোয়া
লজ্জাবতী লাজ পেলো আজ
দেখে ওদের সব খোলা—
তোমায় বলি ইটখোলা।

শীতের দিনে ওই যে ওদের,
জড়িয়ে আছে র‍্যাপার রোদের
ধপ ধপাধপ সাজাচ্ছে ইট
ওদের কি ভাই যায় ভোলা,
তোমায় বলি ইটখোলা।

ওদের পায়ের নীচে যতো
পুড়ছে রে ইট শত শত,
দহন জ্বালা ওদের মাঝেই
দিবস রাতি খায় দোলা
তোমায় বলি ইটখোলা।

শূন্য উদর আদুল গায়ে
শুষ্ক মুখ আর ধূসর পায়ে
বার করে ইট টকটকে লাল,
লরী ভরে হয় তোলা
তোমায় বলি ইটখোলা ।

মেহনতের স্বপ্ন যে আজ
নতুন করে বুঝছে সমাজ,
তুমিতো বেশ নীরব আছো
তুমি বুঝি সব ভোলা,
তোমায় বলি ইটখোলা ।

শোনো বলি, ইটখোলা
দুদিন বাদেই ছিনিয়ে নেবে
সর্বগ্রাসী তোর নোলা,
ইটের মতোই পুড়ছে ওরা
নরম মাটি শক্ত করা,
টকটকে লাল এদের বুকে
সমাজ দারুণ খায় দোলা
তোমায় বলি ইটখোলা ।

২১শে ফেব্রুয়ারী

বাংলা ভাষার রক্তে ভাসে সীমান্তে মোর আত্মীয়েরা
লিখতে কিছুই উৎসাহ নেই তোমার জন্মবার্ষিকীতে ;
তবু যখন অনেক করে লিখতে কিছু বলছে এরা—
আবোল তাবোল হিজিবিজি বাধ্য হয়েই হচ্ছে দিতে,
তোমার জন্মবার্ষিকীতে ।
বাংলা ভাষার কশাইখানায় তোমার পুজোর বাদ্যি বাজে
আহা রে আজ থাকতে যদি নিজের চোখে দেখতে সবই,
শান্তিকেতন কিসের নাচন তোমার ছবি নম্র লাজে,
উৎসবে তাই নিরুৎসাহ বিশবসেরা শ্রেষ্ঠ কবি ।

তোমার বীণার কণ্ঠ ধরে ওদের আদর সর্বনেশে,
বেসুরে সুরে নিত্যি রেওয়াজ ভালোবাসা ধুকছে ক্রমে,
তোমার স্মৃতি আড়াল করে আমরা আছি ছদ্মবেশে,
অসংখ্য চোখ অশ্রু ঝরায় অসংখ্য মন যাচ্ছে দমে।

আকাদমি এখনো প্রায় ঘোমটা খুলেই খেমটা নাচে,
অন্ধকারের অদৃশ্য হাত নিয়ন্তা সব সংস্কৃতির
দেখছি কেবল নৃত্য প্রেতের ছ'সাত কোটির মাথার কাছে
জাল খেতাবী ধরছে এখন রেশটুকু আজ তোমার স্মৃতি।

যাকগে কিছু লিখবো না আর বিশেষ লেখা বিপজ্জনক,
কেবল শুধাই চুপি চুপি স্বর্গে কি কি লিখছো নতুন—
বাংলাতে আর লিখছো নাতো লিখলে ওদের নড়বে টনক,
টোটকা তাবিজ ইত্যাদিতে হাড়ে হাড়ে ধরাবে ঘুণ

যে সব সাথী সদ্য গিয়ে করছে নালিশ তোমার কাছে—
তাদের কাছেই আছে খবর বাদবাকি যা জানার আছে।

নীরোর বাঁশী

নীরোর বাঁশী শুনেছো নীরোর বাঁশী—
রোমের রাজপ্রাসাদ থেকে নয়, দিল্লীর মসনদ থেকে!
আগুন দেখেছো আগুন—
যার লেলিহান শিখায়
রোমের আকাশ বাতাস সন্ত্রস্ত করেছিলো,
বৃদ্ধ যুব মহিলা শিশুদের অন্তিম আর্তনাদ
সেই আগুনেই আজ দাউ দাউ করে জ্বলছে
পাঞ্জাব থেকে আসাম, মারাঠা থেকে মহীশূর—
অথচ দিল্লী থেকে একটানা বেজে চলেছে
ভারতীয় নীরোর একটানা বাঁশী—
আর সেই তালে নেচে চলেছে,
দেশজোড়া রাজনৈতিক প্রেতের দল—

আশ্চর্য ইতিহাসের অবিকল ফিরে আসা,
নীরো নেই
বেঁচে আছে রোম—
অসংখ্য শ্রমজীবি মানুষের উচ্ছল প্রবাহে
ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ইতিহাসের দিকে এগিয়ে চলেছে
ভারতীয় নীরোও থাকবে না—
থাকবে না ভারতীয় নীরোর দাঙ্গাবাজ সাঙ্গোপাঙ্গরা
অচিরেই আশ্রয় নেবে ইতিহাসের আবর্জনায় ;
বেঁচে থাকবে ভারতের গণশক্তি—
পাঞ্জাব থেকে আসাম কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা
চলমান জীবনের উন্নত ইতিহাসে।

মুখোশের অন্তরালে

শোনো মজাদার কথা ইতি উতি এখেনে সেখেনে
ঈশ্বর বেড়েছে খুব ইতস্তত ভক্ত ছড়াছড়ি—
ডাকাবুকো দেবদেবী, এই ধরো শনি কালো শীতলা ইত্যাদি
মস্তানের হস্তগত প্রতিটি রাস্তার মোড়ে বন্দী খাঁচাঘরে।

শোনো মজাদার কথা লক্ষ লক্ষ গরীবের রক্তমাংস হাড়ে
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পাকাপোক্ত এদেশের বিচিত্র বাবারা—
হরে রাম হরে কৃষ্ণ ধম্মে কম্মে বাণিজ্যে বসতি
দেশী ও বিদেশী জোট অভিনব বড্ড অভিনব।

দেশী ও বিদেশী জোট মজুরের রক্তমাংস হাড়ে
শোনো মজাদার কথা ইদানিং সহ্যটা অস্থির ;
ভয়ঙ্কর ভয়ংকরী শনিকালী যাচ্ছেতাই কান্ড পথেঘাটে—
তাধিন তাধিন নাচে ভক্তবৃন্দে বিশ্বব্যাপী বিচিত্র বাবারা।

শোনো ভয়ঙ্কর কথা গ্রামে গঞ্জে গরীবের নিকোনো উঠোনে,
মুখোশের অন্তরালে ধম্ম কম্ম অন্নজল টোপ।

প্রতিভাস

চালচুলো নেই কবেকার সেই দুরন্ত রোদ্দুর
বিস্তৃত বহুদূর—
হামাগুড়ি দিতে দিতে, কখন অলক্ষিতে,
জোরালো আলোর খুর—
অবাক জনতা প্রশ্ন কি আছে, ক্ষতি ?
শূন্যে কি সঙ্গীত ?
সারাদিন সারারাত, হৃদয়ে দৃষ্টিপাত
সমৃদ্ধ তেজারতি।
সহসা শুনেছি কথা কও কথা কও—
সাহস আমার ধৈর্যে ধৈর্যে স্থির ;
বিরোধ তুমিও সকালে বিকালে আভূমি আনত হও।

অবাক অবাক অসংগতি

একটু আগেই রামা এবং হাসিম শেখের খবর পেলাম ফোনে
দুর্বিপাকের রাত্রী ঘেঁটে গোলায় যখন ফসল তোলা শেষ,
আরেকটা ভাই খবর পেলাম সামন্তজীর চাঁদনী চকের কোণে,
মুখোশপরা ভিড়ের থেকে নামলো হঠাৎ জঘন্য নির্দেশ—
সঙ্গে সঙ্গে লাখ জনতার বাঁধা—
অবাক অবাক অসংগতি বুঝতে গিয়েই অনেক বাবুর ধাঁধা।

একটু আগেই খবর পেলাম রামধারী সিং এবং লাখে লাখ,
আট ঘন্টা কাজের সীমা এই দাবীতে কাজ ছেড়ে একজোট—
বিড়লা-টাটা-সিংহানিয়ার ছটফটানি প্রচন্ড হাঁক পাঁক,
প্রেত জমানার লুম্পেনদের চোলাই মদে চোবাল একচোট—
সঙ্গে সঙ্গে লাল নিশানের বাঁধা—
অবাক অবাক অসংগতি বুঝতে গিয়েই দিল্লীরাজের ধাঁধা।

গল্পটা তারপর

গল্পটা তারপর ? গল্পটা তারপর ?
তারপর সেই রানীর দাপট বলতে আমার ভয়—
সারা দেশ জুড়ে ভুখা মানুষের রক্তের তহবিল
সেইখেন থেকে উঠে এলো এই সমাজের গরমিল ।

গল্পটা তারপর ? গল্পটা তারপর ?
পরস্পরের কাছাকাছি হলো লক্ষ লক্ষ ঝড়—
ক'দিন ক'রাত মাটিতে ও মনে হলো নানা কানাকানি
চারিদিকে ধূ-ধূ ঘন উদ্বেগ আঁতকে উঠলো রানী ।

গল্পটা তারপর ? গল্পটা তারপর ?
তারপর সারা রাজপথ জুড়ে বিদ্যুৎ কড় কড়—
ঝঞ্ঝা বাদল থিতু হয়ে গেলে দেখলো অবাক চোখ
যে যার দুপায়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রোখা কোটি কোটি লোক ।

আমার ফাঁসির পর

ভোলগা নদীর ওপারেতে হচ্ছে আমার ফাঁসি
জগৎ জুড়ে নৃত্য কাদের ? কাদের এত হাঁসি ?
এমন হাসির সাক্ষ্য বুকে ঘুমোয় ইতিহাস—
সেই হাসিতো থামিয়েছিলো ফ্যাসিবাদের ত্রাস,
তখন তো সব বাস্তুঘুঘু বাঁধলে এসে জোট—
আমার ঘরেই ; লড়লে সবাই কামড়ে যে যার ঠোঁট ;
বিশ্বদানোর কবল থেকে বাঁচলো ধরাতল,
এখন আমার হচ্ছে ফাঁসি তাতেই কোলাহল ।

চিলি এবং ইন্দোচীনের দূরত্ব কই আর—
সত্য শুধু ইন্দোচীনই বলছি বারংবার ;
কিউবা থেকে বার্তা আসে চীন থেকে আশ্বাস
এতই সহজ মানবজাতির আগাম সর্বনাশ ?
ভবিষ্যতের দিকেই মানুষ তাকিয়ে আছে ভাই
ফাঁসির আগেই বারুদগুলো ছড়িয়ে দিয়ে যাই ।

রকবাজী।

চুরি ছ্যাঁচড়ামি বেছে নেবোখন যাহোক একটা কিছু
চাকরী চাইতে কখনো কোথাও করবো না মাথা নীচু—
রাজু রোজ বলে আড্ডার দলে কলেজের রকে বসে—
মাধ্যমিকটা আমাদের মতো পাশ করে ঘসে ঘসে।

ফোর্থ ইয়ারের একটা মেয়েকে হঠাৎ বাসলাম ভালো—
সেকথা জানাতে শুরু করে দিল ফন্দিফিকির চালও,
ক্রমশঃ জানলো মেয়েটা ভীষণ দেমাকী এবং ধনী—
রাজুকে ওদিকে আর না এগুতে নিষেধ করল ননী।

অবশেষে সেও প্রতিদান দিলো চিঠিপত্তর লিখে,
চলনে বলনে বেঁধে ফেললো সে রাজুর হৃদয়টিকে—
তারি তাগাদায় রাজু করে শুরু চাকরীর পিছু ছোটা
দেখতে দেখতে শিকেয় উঠলো রকের সে আড্ডাটা।

ছোটাছুটি শেষে রাজু অবশেষে চাকরীর চিঠি পেলো,
ঠিক একই সাথে মেয়েটা করলো বি. এ. ফাইনাল ফেলও ;
বিয়ে পাকা হলো ধার দেনা করে দিয়ে দুইগাছা বাজু—
কাজে যোগ দিলো যেদিন সেদিনই খুন হয়ে গেল রাজু।

দুর্গাবন্দনা

দশ হাত আজ কেটে ফেলে দাও দরকার নেই অস্ত্রে—
অসুরকে তুমি বন্দনা করো পার্বতী, গলবস্ত্রে,
রক্তলোলুপ দস্যুরা আজ সারা পৃথিবীতে জয়ী
প্রয়োজন নেই কোনো অস্ত্রের তব দশ হাতে অয়ি,
হয় হাত কাটো, নয় দশ হাতে তোষামোদ তুলে আনো
চাষা মজুরের মেহনতে মাখা মালা চোখ ঝলসানো,
সেই মালা দিয়ে বিশ্বের ত্রাস অসুরের করো স্তুতি,
শুরু হয়ে যাক মেকি দুনিয়ায় প্রলয়ের প্রস্তুতি।

সিংহপালকে কেন ধরে আছো চলে যাক জঙ্গলে—
লক্ষ্মী সরস্বতীকে পাঠাও ইয়াংকীদের দলে,
শহরের রকে বন্দি হয়ে থাক কালোয়াত কার্তিক—
সিদ্ধিহস্ত কালো কারবার ভালো করে বুঝে নিক ;
আর তুমি নিজে দশ হাত কাটো নয় দশ হাত ভরে—
স্বর্গের নানা ঘুষ নিয়ে এসো মর্ত্যনেতার ঘরে।

শৈশব থেকে দেখছি তোমার অস্ত্রের কেরামতি,
পাথরে প্রাণের সাড়া মিললো না মৃন্ময়ী, পার্বতী—
শরীর তোমার অস্ত্রে সাজানো বৃথা হয়ে গেছে মাগো
লাড়াই-এ মানুষ ক্ষতবিক্ষত একবার শুধু জাগো—
হয় সাড়া দাও, নয়তো এসো না দুঃখ বাড়াতে আর,
তৃষিত মর্ত্যে, হে মৃতাশক্তি, দুর্গা নমস্কার।

একদিন প্রতিদিন

সাহেব বিবি টেক্কা গোলাম ঐতিহাসিক সুখ,
বর্তমানের বুক চিরে এক দৈত্য নাচে রোজ ;
কি নাম যেন, কি নাম যেন, চালাক চতুর বেশ—
হরিণ মেরে একটু আগেই ফিরলো পোড়া দেশে।

দুহাত বাঁধা বুলেট বেঁধা লজ্জা সরম ভুল,
ঐরাবতে ইন্দ্ররাজার মুখোশ ঢাকা মুখ ;
বুদ্ধিজীবি, ছাপার হরফ বিশ্বাসী যৌবন—
কি কুক্ষণে অন্ধকারে জন্ম তোমাদের।

সারকাসে এক দক্ষ জোকার মুখ্য ভূমিকায়,
সমস্ত চোখ দখলে তার ; সমস্ত সংসার
বেদম প্রহার জর্জরিত ;—মৌন প্রতিবাদ
অর্থনীতির সূত্রগুলো দিচ্ছে হামাগুড়ি।

মানসীকে

মানসী, তোমার ঊর্মিমুখর মনের কাছে—
যত্নে সাজানো সোনালী রঙের পাহাড় আছে,
তার পাদদেশে হয়তো এখনও দৈন্য নেই—
যা কিছু শান্তি যাবতীয় সুখ আছে আছেই।

জানোতো এখেনে প্রতিমুহূর্তে কি সংশয়!
রৌদ্র দিনকে হারিয়ে ফেলার ভীষণ ভয়,
দুপুরের রঙ কখন মুছবে! তোলো না মুখ-
বিজলী চমক পান করে যাই এক চুমুক।

হৃদয়ে এখনও শৈশবকাল জ্বালে প্রদীপ—
অধরে তোমার সেই আলোকের মৃদু ঝিলিক;
তুমি আছো এই অসীম সত্য হয়নি ম্লান —
এখনো পাখির পালকে সাজানো আমবাগান।

বণিকেরা এসে কেড়েছে নগর, নদী, পাহাড়,
মানসী, তোমার বসনে এখনো সবুজ পাড়।

কবিতা / প্রবীর জানা

হারিয়ে যাচ্ছে

আমি এক পথহারা পথিক !
আমার ক্লান্ত পায়ে লেগে আছে
অতীতের ঘন কালো ছায়া।
আমি হেঁটে চলেছি গহন অরণ্যে—
সমুদ্র পেরিয়ে এক অন্ধকার দ্বীপে।
আদিম মানুষের কী বীভৎস রূপ !
তবুতো দেখেছি মায়ের বুকে
শিশু অসহায় নির্বিকার !
বন্য হৃদয়ের দাবানল শিখা
পাথরের বুকে বার বার তোলে
ভালোবাসার শিহরণ !!

তবুও আমি হেঁটে চলেছি।
অন্ধকার থেকে আলোর পথে।
সভ্যতার এ কী বিবর্ত্তন—
মায়ের চোখের জল শুকিয়ে গেছে
মিশাইল আর স্কাডের আলিঙ্গনে !
ভোরের আগে একটা অশুভ চিৎকারে
জেগে ওঠে এই পৃথিবী !
বুকে তার হাজার প্রশ্ন—
এত আলো এত ভালোবাসা
তবু কেন সে হারিয়ে যাচ্ছে
আদিম সভ্যতার গভীর অন্ধকারে !!

এ ঝড় থামবে না

ঝড় উঠেছে দিনের শেষে আঁধার ভেলায় লম্বা যে তার পা,
গঁড়িয়ে দেবে নকল রাজার মাথার মকুট উজার নগর গাঁ।
বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান ঈশান কোণে মেঘের গরুগরু,
এ ঝড় উঠে যায় যে ছুটে দেখছে যখন হা-হুতাশের শুরু।
ভাঙবে এ ঝড় বুকের পাঁজর রক্তচোষা দৈত্য-দানব হাঁ,
এ ঝড় কী আর থামবে না হায়, থামবে না আর ? না না না না !!

কখন সাদা কখন কালো নীলচে সবুজ লোহিত দিয়ে ঢাকা,
রংবদলের পালার দিনে ছড়ায় এ ঝড় স্বপ্ন রঙিন পাখা।
ইরাক ইরান আফগানিস্তান গ্রীস রাশিয়া চীন জাপানের বুকে,
জ্বালিয়ে আগুন জাগিয়ে ফাগুন উঠলো যে ঝড় ছুটলো মনের সুখে !
দুলছে এ ঝড় নাচছে এ ঝড় কখন কাঁপে কখন হাঁপে নাই যে মুখে রা,
এ ঝড় কী আর থামবে না হায়, থামবে না আর ? না না না না !!

উঠছে এ ঝড় হাটে মাঠে পথে ঘাটে সর্বহারার শ্বাস ;
কাঁদায় হাসায় কেউবা বলে—হায়রে, একী ঘটলো সর্বনাশ !
সেদিন এ ঝড় উঠেছিল জগৎ জুড়ে ঢেউয়ের রাশির তালে,
রক্তরেখায় এঁকে দিল কিসের নেশা হৃদয় নায়ের পালে ?
ভাঙতে জানে গড়তে জানে আসবে এ ঝড় এলিয়ে দিয়ে গা,
এ ঝড় কী আর থামবে না হায়, থামবে না আর ? না না না না !!

জীবন নিশান

সমাজটাকে গ'ড়ছে যারা বুকে দিয়ে ভিত
ভেবে দেখার পায়না সময় হার হ'লো না জিৎ !
আছেন যেসব সমাজসেবী শিল্পী লেখক কবি
তুলে যেন ধরেন তারা এই মানুষের ছবি।

আকাশ ছোঁয়া প্রাসাদ যে ঐ দাঁড়িয়ে শহর মাঝে
যাদের পরশ ছড়িয়ে আছে সব ইঁটেরি খাঁজে,
আছেন যেসব সমাজসেবী শিল্পী লেখক কবি
তুলে যেন ধরেন তারা এই মানুষের ছবি।

দুপুর-রোদে বুকের মাঝে টানছে হাপর-শ্বাস,
মৃত্যু যাদের নিত্য সাথী—খাটছে বারো মাস।
আছেন যেসব সমাজসেবী শিল্পী লেখক কবি
তুলে যেন ধরেন তারা এই মানুষের ছবি।

এই সমাজের জীবন-নিশান যার কাঁধেতে রাখা
টানছে সমাজ রথের দড়ি ঘুরছে সমাজ চাকা!
আছেন যেসব সমাজসেবী শিল্পী লেখক কবি
তুলে যেন ধরেন তারা এই মানুষের ছবি।

সবার মাঝে আছেন তিনি

হাবা বলে, শোন্‌রে গবা ক'রছেন এপ্রিল ফুল,
নায়ে চেপে আসছেন দেবী এসব কথা ভুল!
কাটতে হবে নদী ও খাল এলে নায়ে চেপে,
ঝড়-ঝঞ্ঝার ভয়ে দেবী যান যদিরে ক্ষেপে!
কৈলাসেতে থাকেন তিনি অনেক দূর সে-পথ,
আসতে ঠিকই পারেন তিনি চেপে পুষ্প-রথ।
গবা বলে, খাস্‌তো শুধু হালুয়া ক'রে সুজি,
গাধার সাথে আছে যে তোর বুদ্ধির রেশ বুঝি!
ক্লাবে ক্লাবে চ'লছে লড়াই আকাশ পথে এলে,
হাইজ্যাকাররা গিয়ে সেথায় দেয় যদি রথ ফেলে?
হাবা বলে, গবার টাকে মেরে একটা চাঁটি—
মিছে শুধু করিস্‌ বড়াই জীবনটা তোর মাটি!
আসবেন দেবী ঠেলায় চেপে লরি কিংবা ভ্যানে,
থাকেন তিনি কুমোরপাড়ায়, মিথ্যা ভাবিস্‌ ক্যানে?
গবা গেল বেজায় রেগে দিয়ে গোঁফে তা;
মনের চোখে দেখ্‌না চেয়ে কোথায় আছেন মা।
হাবা বলে, সত্যি গবা বুদ্ধিতে তুই বাড়া—
সবার মাঝে আছেন তিনি ডাকলে দেবেন সাড়া!

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যে খুশিতে চাঁদের হাসি জুড়িয়ে দেয় প্রাণ
যে খুশিতে হৃদয় ভরায় শিউলি ফুলের ঘ্রাণ
তার চেয়েও বড় খবর বাংলা ভাষায় যিনি
কথাশিল্পী খেতাব পেলেন শরৎচন্দ্র তিনি !!
যে ভাষাতে কথা বলি আপন জনের সাথে
যে ভাষাতে হৃদয় নাচে জীবন শুরুর প্রাতে
তার চেয়েও সুখের কথা বিশ্ববাসীর কাছে
শরৎচন্দ্র সব মানুষের হৃদয় জুড়ে আছে !!
যে সুখেতে ঘুমায় অলি খেয়ে ফুলের মধু
যে সুখেতে বাংলা বলে ছেলে বুড়ো বধূ
তার চেয়েও সুখের স্মৃতি যারা বধির মূক
কথাশিল্পী ধরেন তুলে তাদের দুঃখ সুখ !!

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি

বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে
মামার বাড়ী কাজলাগড়ে,
সাত-সমুদ্দুর আকাশ পারে
তাল-সুপুরি, বাঁশের ঝাড়ে ।
বৃষ্টি ঝরে, বৃষ্টি ঝরে
শালুক ফুলে, ঘাসের 'পরে,
ঝড়ের তালে মুক্তো দোলে
কাজল-কালো মেঘের কোলে !!
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি নামে
আলতো রোদে রূপোর খামে,
অদূরে গাঁয়ে বাজনা বাজে
ইলশেগুঁড়ি পাতার মাঝে !
বৃষ্টি থামে, বৃষ্টি থামে
সুদূরে মাঠে ওই যে গ্রামে,
নীল আকাশে মেঘের ঝুরি
শিব ঠাকুরের জটা চুরি !!

রথের মেলা স্মৃতির ভেলা

আষাঢ় মাসের দুপুরবেলা
রিম-ঝিম-ঝিম বৃষ্টি পড়ে
জগন্নাথের রথের 'পরে !
টানছে এসে রথের দড়ি
জগন্নাথের যত চেলা !
রথের মেলা, রথের মেলা !!

বাড়ছে ভিড় বাড়ছে বেলা
দোকান সারি পাঁপড় ভাজা
হাসছে বাতাস গন্ধে তাজা !
মাসির বাড়ি ছুটছে রথ
জগন্নাথের এ কী খেলা !
রথের মেলা, রথের মেলা !!

ভাঙল মেলা সাঁঝের বেলা
ফিরছে সবাই একা একা,
থাকল প'ড়ে স্মৃতির রেখা
অলসভাবে মনের কোণে
কল্পলোকে ভাসিয়ে ভেলা !
রথের মেলা, রথের মেলা !!

রাত হয়েছে দুপুর

গাছের ডালে নাচছে ছায়া এক দুই তিন চার,
উঠছে ভেসে জোনাকী চোখ অন্ধকারে কার !
আমার দিকে আসছে ছুটে ভূতের মতো কারা !
দেখছে চেয়ে মাঝ আকাশে ওই যে ক'টি তারা।
তারারা সব জুটলো নাচ বাজছে পায়ে নুপুর,
ঘুম ভাঙতেই হঠাৎ দেখি রাত হ'য়েছে দুপুর।

রেলের গাড়ি

দিচ্ছে পাড়ি	রেলের গাড়ি	তাড়াতাড়ি
বনের ছায়ে	যাচ্ছে গাঁয়ে	ডাইনে বাঁয়ে
আকাশ নোয়া	দিচ্ছে ছোঁয়া	কালো ধোঁয়া
জগৎ জুড়ে	ঐ যে ওড়ে	বাতাস ফুঁড়ে
কোথায় মেশে	দিনের শেষে	কোন্ সে দেশে
লাগাম ছাড়া	ছাড়ছে পাড়া	কিসের তাড়া
আগুন পোড়া	ছুট্‌ছে ঘোড়া	লোহায় মোড়া
অচিন পুরে	আস্‌ছে ঘুরে	রাত দুপুরে
উঠ্‌ছে ঝাঁকি	দুটি আঁখি	দানব নাকি
ছুট্‌ছে দুলে	কাঁপছে পুলে	নদীর কূলে
আঁধার টোটে	আলো ফোটে	রেল যে ছোটে !!

লাগলো ভীষণ লড়াই

শোন্ খুকুরে শোন্ মুকুরে
পড়লো হঠাৎ বাজ,
এলো পবন রাজ
হাতে যে তার মস্ত অসি
মাথায় মেঘের তাজ।

রাত দুপুরে মেঘ-পুকুরে
জুড়লো এসে নাচ
হাজার মেঘের মাছ,
আকাশ মাঝে হারিয়ে গেলো
তারার হাসির ছাঁচ।

ভোর লগনে মাঝ গগনে
লাগলো ভীষণ লড়াই,
ভাসছে মেঘের কড়াই
কেউ বা বলে মেঘের পুকুর
জল ভর্ত্তি ঘড়াই।

চোখ

চোখাচোখি দেখাদেখি ঘটে নানা ক্ষণে,
কত চোখ চোখে পড়ে থাকে কি তা মনে !
পটল-চেরা চোখের বাহার দেয় যে মনে দোলা,
হরিণ চোখের কাজল রেখা যায় কি কভু ভোলা ?
আড় চোখেতে মিষ্টি হাসি ইঙ্গিতেরই সুর,
আলতো চোখে হাল্কা চাওয়া অতি সুমধুর।
দুষ্টু চোখে ঠোঁটের ফাঁকে একটু বক্ররেখা,
যায় প্রীতিটা বিদায় বেলা সজল চোখে দেখা।
পলকবিহীন দুই চোখেতে একটি ঝলক চাওয়া,
ঢেউ খেলে যায় মনের মাঝে মনের চাওয়া পাওয়া।

নস্যি বুড়ো

নস্যি বুড়োর নাম শুনেছো ? চেন তোমরা তাকে ?
ইয়া বড়ো লম্বা নাক পুকুড় পাড়ে থাকে।
একদিন ঠিক দুপুরবেলা ভ'রল আকাশ মেঘে,
টাইফুন আর হ্যারিকেন আসছে ছুটে বেগে।
নস্যি বুড়ো বলল হেসে, দাওনা আমায় নস্যি
এক হাঁচিতে উঁড়িয়ে দেবো ঝড়-ঝঞ্ঝা দস্যি !
কোত্থেকে এক দুষ্টু ছেলে গল্প বলার ফাঁকে,
লঙ্কা গুঁড়ো দিল গুঁজে নস্যি বুড়োর নাকে।
ছুটছে বুড়ো জ্বলছে নাক দিচ্ছে লম্বা লাফ,
ঝ'রছে ঘাম টাকের মাঝে, বলছে—বাপরে বাপ !
নস্যি বুড়ো যাচ্ছ কোথায় ? শুনে সবাই-র ডাক—
বলল বুড়ো,—ভেজাল নস্যি ! অন্য কথা থাক !!

বেজায় গরম

গরম-গরম, গুমোট গরম তপ্ত অরুণ রাগে,
মাথার 'পরে দুপুর যখন নির্জনতায় জাগে !
শুষ্ক হাসির রুক্ষ ছোঁয়া বৃক্ষ প্রান্ত ভাগে—
মাঠের শেষে গ্রামের ধারে জীর্ণ খালের আগে !!

গরম গরম, ভেপসা গরম আকাশ জুড়ে নীল,
কাঁপছে দাদুর বুকের পাঁজর খোকা-খুকুর দিল !
ক্লান্ত গাছের পাতার নীচে আগুন পোড়া চিল,
হতাশ হ'য়ে হাঁপছে কেবল নদী ও খাল-বিল !!

গরম গরম, বেজায় গরম তীক্ষ্ন রোদের ফাঁকে,
হঠাৎ আসে মেঘের ছায়া বৈশাখীরই হাঁকে !
ধরার বুকে প্রলয় নাচে বৃষ্টি আসে ঝাঁকে,
নতুন ক'রে বাঁচার ছবি সৃষ্টি ব'সে আঁকে !!

সমাজ দর্পণে পুজো

[এক]

দেখব পুজো কাছে দূরে শহর ঘুরে অচিনপুরে হাট-বাজারে,
দেখব পুজোয় হাসছে মায়ে গঞ্জে-গাঁয়ে ডাইনে বাঁয়ে পথ-মাঝারে।
দেখব পুজোয় শিশির ঘাসে শরৎ ভাসে শিউলি বাসে ঢাকের তালে,
দেখব পুজোয় খুশির রাশি বাজায় বাঁশি রোদের হাসি সোনার জালে।
দেখব পুজোয় মূর্তি আঁকে ঝিনুক শাঁখে—সাজায় মাকে কল্পনাতে ;
দেখব পুজোয় প্রদীপ জ্বালায় মনের থালায় বরণ মালায় জল্পনাতে !!

[দুই]

সেবার পুজোয় মানুষ পাহাড় পিষে গেলো মিশে গেলো
পায়ের চাপে ভীড়ের ঠেলায়,
সেবার পুজোয় রঙিন কাঁচে চুমুক দিয়ে নেচেছিলো কত মানুষ রাতের বেলায়।
সেবার পুজোয় বারুদ নিয়ে দাদারা সব খেলেছিলো গলায় মেডেল ছুরি আঁকা,
সেবার পুজোয় চাঁদার লুটে গেলো ছুটে কত চেলা কথায় ওদের আতর মাখা।
সেবার পুজোয় কতই অনাথ লড়েছিলো ঝড়-বাদলে আকাশ তলে হাসপাতালে,
সেবার পুজোয় মরলো কত অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায়—
বলেছিলো দুই মাতালে।

কবিতা / অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

আকাশকে ভালোবাসতে হবে

আকাশকে ভালোবাসতে হবে
আঁখি-পাতা মেলতেই হবে
উচ্চরন্ত সূর্যের পানে
তার হিরণ্ময় আবরণে
আর অনন্ত সত্যের উৎসে
তাকাতে তাকাতে তাকাতে
দেখতে পাবোই একদিন
সুন্দরের রূপ সত্যের সন্ধান।

যত ঊর্দ্ধে

যত ঊর্দ্ধে থাকবে থাকুক
আকাশ নীচেতে নামে
নীচেরও নিঃসীম তলে
বিরাটত্ব অব্যাহত
তবু উদাসীন উদারতা
আত্ম প্রসারণ আনে
অবিরত অবিরাম।

ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা

ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা
মরেও মরেনি এখনো
সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তারা করে বাস
নিঃসঙ্কোচ অশালীন আচরণ
তাদের তির্য্যক চরণ অক্টোপাশ
আর বিষাক্ত কুটিল আকর্ষণে
জর্জরিত সমাজ—বিলায় যৌবন।

আঁধারেতে চোখ রাখি

আঁধারেতে চোখ বুজি
আঁধারে আঁধার মেশে
আলোকেতে চোখ মেলি
অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে
দুটোই সমান নিয়মেতে
কারো প্রতি বিরাগের
কিম্বা কোনো আকর্ষণের
সহজ শিকার নই আমি।

আশা নিরাশার অশেষ স্পন্দন

বিরতি প্রবণ বসন্ত বর্ষার
হাত ধরে অনেকটা এগিয়ে
পিছিয়ে পড়ার সত্যতার
ব্যাঘাতের আঘাত সইতে হয়
মুগ্ধকর নয়ন মনের প্রাপ্তি সংবাদের
নিরবচ্ছিন্ন আশ্বাসে আশ্বাসে
ধরিত্রীর বুক চিরে ধরিত্রীর
বুকের ভিতর আশা নিরাশার অশেষ স্পন্দন।

পাতাল ফুঁড়ে যে বিষ ওঠে

পাতাল ফুঁড়ে যে বিষ ওঠে সে-বিষ ভয়ঙ্কর,
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ছড়িয়ে রয় আকাশ পরিসর।
রাত্রি দিবস ভাবনাতে তার কোন্‌খানে পায় ফাঁকা ?
রুশ চীন আর ভিয়েত্‌নামে জ্বালতে হবে আখা!
নিত্য নূতন হিরোসিমা ইরাকে বাগদাদে,
আফগানিস্থান ধ্বংস হল উদাস অপবাদে!

আমি বামুন হলেও আমার

সত্য বলার স্বভাব ছেড়ে বেকার যুবক এক,
বিয়ে করল মেয়েকে যার বংশ বটে শেখ !
শেখের মেয়ে চরখা কাটে, পৈতে বানায় ভালো,
কিনতে আসে বামুনেরা সব গায়ের রঙ্‌টা কালো।
শেখের মেয়ের পৈতে পরে যুবক কয়ে যান,
আমি বামুন হলেও আমার বউটি মুসলমান।

উলটো চালে চলা

ভেড়া যত গান গাইবে, শুনবে গরু গাধা।
এমন হলে ছেড়েই দেবে মানুষ গলা সাধা !
রাত রবে না দিন রবে না, যুদ্ধে যাবে সবে,
চাষ রবে না—গরু ভেড়া বাঁচার খাদ্য হবে !
শিয়াল কুকুর খুসী হবে, বেশ চিবোবে হাড়,
বিড়াল ভাববে, শিয়াল তাদের মটকাবে না ঘাড় !
কি হলে যে কিনা হবে, যায় না আগে বলা,
হিরোসিমা বন্ধ ক'রে উলটো চালে চলা !

ধামাক্রেসি

রগচটা এক রাজা ছিলেন সবার 'পরে রাগ,
রাণী বলেন, এবার থামো নইলে হবে ছাগ !
ছাগল কি কেউ হয় কখনো বলেন রাজা রেগে,
রাণী বলেন, দেখবে তখন সকাল বেলা জেগে !
রাজা এবার ভাবেন মনে রাণীটা ঠিক নয়,
আচ্ছা করে পিটান দিলে ঠান্ডা হয়ে রয় !
যেই রাণীকে মারতে আসেন—আসলো ছুটে প্রজা,
ধামাক্রেসির ঠেলায় রাজা বুঝলো রাগের মজা !

কোমর বেঁধে নাবো

উল্টোরথের কেমন ধারা সমুখপানে চলে,
বুঝিনাকো সোজারথকে উল্টো কেন বলে !
সোজায় যারা সোজা দেখে গেল কোথায় তারা,
শুনিনিতো এমন কথা সবাই গেছে মারা !
আজও শিয়াল হুক্কা ডাকে ডাহুক ডাকে কক্,
কাকেরা সব কালোই আছে যেমন সাদা বক !
কেন তবে সোজারথকে উল্টো বলতে যাবো,
যা দেখি তা বলে ফেলতে কোমর বেঁধে নাবো !

সবাই সর্বনাম

ধানের মাঠে ধান ফলে না ফাঁকায় ফাঁকায় মাঠ,
নদীর বুকে বাঁধ পড়েছে নেইকো খেয়াঘাট !
শহর ফুলে হচ্ছে মোটা বন্যা খরা গাঁয়ে,
রাস্তা ঘাটে আবর্জনা কোথায় হাঁটবে পায়ে !
মন্ত্রীগুলো যন্ত্রী হোলো চিমনি নাকে নাকে,
মেঘেতে নেই এক ফোঁটা জল ইন্দ্রধনু আঁকে !
কেমন করে বাঁচবে শহর বাঁচবে ধানের গ্রাম,
পণ্ডিতেরা বিশেষ্যহীন সবাই সর্বনাম !

তোমার প্রাণের উচ্চারণে

যে জীবন পাই তোমার প্রাণের সতত উচ্চারণে,
তা অব্যাহত রাখার শক্তি দাও প্রতি জনে জনে।
তোমার স্বস্তি শান্তি আসুক হৃদয়ের প্রসারণে,
পবিত্রতার আলোক লাগুক সবাকার দেহমনে।
সবাকার এক সমান সমিতি একসাথে চলবার,
দিনমান নেমে পৃথিবীকে দিক এক কথা বলবার।
প্রাণের জোয়ারে এক সাগরের প্রাণদ থাকার জল,
সবার প্রাণেতে অমৃত রবে প্রাণ ধারণের বল।

বাইশ বছর পর

পথ চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম,
এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল মনে
বাইশ বছর পর।
ফিকে সূর্যটা গাইছে আগমনী
নীলগিরি পাহাড়ের চূড়োয় বসে,
সন্ধ্যা হয় হয়।
টক্‌টকে লাল সিঁদুরে সিঁথি—
শাঁখা আর পলায় রাঙা হাতে
ছোট্টো একটা জরুল।
শৈশব, যৌবন ফেলে প্রৌঢ়ত্বের পথ বেয়ে
ক্লান্তিকে ক্লান্ত করে এগিয়ে চলেছে
জীবন-সন্ধ্যার দিকে।
কয়েক মুহূর্তে হারাল বাস্তব
অবাক বিস্ময়ে পিছিয়ে গেলাম
বাইশ বছর আগে —
সেই থাম ঘেরা ঠাকুরদালানে।
কোনোদিন হয়তো বা সঙ্গী হত
একপশলা বৃষ্টি, মেঘের আড়াল থেকে,
কোনোদিন হয়তো বা ভেসে গেছি
সুরের তরী বেয়ে সুদূর অমৃতলোকে,
কোনোদিন হয়তো বা কাজ ফেলে
শুধুই বসে, চোখে চোখ রেখে।
হঠাৎ মনে ওঠে ঝড়, বৈশাখী
ছন্দের বাঁধ ভাঙে চোখের বরষায়,
শুধু একটা ক্ষীণ কন্ঠস্বর
ফাঁকা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে
কেমন আছ, ভালো?

পায়ের নীচে মাটি গেল সরে
বসে পড়লাম কালো পাথরটার গায়
তারপর—;
মুগ্ধ বিস্ময়ে চোখ রেখে রেখে
অতীতের সবুজ পাতা হাতড়ে
ঘণ্টাকয়েক কাটল।
চমক্ ভাঙলো যার ডাকে
সে আমার অচেনা,
নাম 'অপ্রকাশ গুপ্ত'।
দুজন বিপরীত মুখে দাঁড়িয়ে
কালো পাহাড়ের গা বেয়ে
শুরু হল নতুন পথে চলা।
জীবনের ধূসর সীমান্তে গড়ল
আর এক অপরূপ স্মৃতি
বাইশ বছর পর।

বাঁধনহারা ক্যানভাসে

কাক-ভোর আকাশের ক্যানভাসে
পেঁজা তুলো মেঘ আর সূর্য—;
আঁকল পৃথিবী,
সাদা শিউলির ছেয়ে থাকা পথে
বুঝি শরৎ এল,
কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া ছুঁয়ে কান দুলিয়ে
ঐ শরৎ এল।
রিম্‌ঝিম বরষা আর মনদোলানো হাওয়ায়
বুঝি শরৎ এল।
এদিকে, ডিভানে শুয়ে সুখের ক্যানভাসে
তুমি এঁকে চলেছ
তোমার না দেখা স্বপ্ন।

লাল চেলীর আড়ালে বেনারসী জড়িয়ে
যেন এগিয়ে চলেছ,
সিঁদুর রাঙা সিঁথিতে নববধূর বেশে
যেন আঁকড়ে ধরেছ
ফুল সাজানো মোটরে চোখের জলে ভেসে
তুমি এগিয়ে চলেছ।
ওদিকে, ছাতাপড়া মনের ক্যানভাসে
চাপচাপ রক্ত দিয়ে
আমি গড়েছি মানুষ।
যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে
একমুঠো রুটির জন্য,
যারা শকুনডানা রাতে বিক্রি হচ্ছে
বেহায়া পেটের জন্য,
যারা মহুয়ার নেশায় মাতাল হয়ে
একটু সুখ খুঁজছে।
হঠাৎ রক্তমাখা শরীরে ঘরে ঢুকলো বিপ্লব
রঙের প্যালেটটা ছিটকে পড়ল ভবিষ্যতে।
নতুন প্রজন্ম নিয়ে ভোর এল ওদেরও ;
কাক ভোর আকাশের ক্যানভাস ছিঁড়ে—
ওরাও স্বপ্ন দেখবে—।
চার দেয়ালের মাঝে দূরবীণে চোখ দিলেও
তোমার ও স্বপ্ন ফিরবে না,
অত্যাচারের বাঁধন কেটে
শরীর থেকে রক্তের দাগ তুলে বাঁচবে,
ওরা বাঁচবে, আরো-আরো নতুন হয়ে।

নীলকণ্ঠ হ'য়ে

জোয়ার আশার আগেই এল পূর্ণিমা
সুন্দর হল সুন্দরতর,
বাড়ে রাত বাড়ে জীবনের পূর্ণতা
ক্লান্তি নেই, শুধু শান্তি আরো।

সবুজ যৌবনে সাদা শান্তির জ্যোতি
পথ এঁকে দেয় ভবিষ্যতের
কপালের চামড়ায় পড়ে না ভাঁজ
দেনা দায়ে অথবা রেস্তোর চিন্তায়।
হতাশার সরল রেখাগুলো আজ
লিমেরিক ছন্দের ভেলা বেয়ে—
ক্লান্তি ক্ষান্ত করতে ভুলেছে
এলার্জি ট্যাবলেট মুখে দিয়ে।
তন্ময় হয়ে চাঁদ দেখতে দেখতে
ভুলেছিলাম গরল অমৃতেরই উচ্ছিষ্ট।
নীলকণ্ঠ হয়ে মনে হয়
ওষুধের গুণাগুণ আজ দূরে
এতদিন যা ছিল পূর্ণিমা রাত
আজ বাজে বিরহের সুর।
মন সাগরের কূল ফেলে
উথাল পাথাল ঢেউ ছেড়ে
থির জলে ভেসেছি বহুদিন
বুঝিনি ভাটার টান,
তবু এই নাবিক মন
ফিরে চায় পিছনে
মন সাগরের কূল ফেলে
থির জল যেখানে।
আমার নাবিক মন আজ
নীল সাগরের নিথর রূপে ক্লান্ত
লিমেরিক ছন্দ যেন গদ্য কবিতা
গরলই তাই আজ অমৃতসুধা।

আগুন আজো আছে

চলন্ত একটা শবদেহের চিৎকারে
ঘুমটা গেল ভেঙে,
পাখীরা জেগেছে, সূর্য বুঝি উঠলো।
বরফজমা মনে একদলা গলা লাভা
ছিটকে এসে উষ্ণতা দেয় ;

গলতে গলতে মনটা আবার স্পন্দিত হয়
একমুঠো ভালোবাসার ছোঁয়ায়,
আবার আগুন জ্বলে।

শুরু হয় স্বপ্ন দেখার স্বপ্ন
ফিরে চাওয়ার স্বপ্ন,
আলোয় ফিরে বাঁচার স্বপ্ন
ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন।

শেকল ছিঁড়লে বুঝি মন জমে না
জমে মনের খোলস,
আজো আগুন জ্বলে মনে
সূর্যের মতো লাল
আজো আশার আলো দেখি
হীরের মতো উজ্জ্বল।

সময়ের অনুবীক্ষণে

সেদিন ছিল ভুল করার দিন
সে ক্ষণ ছিল জোয়ার আসার
জমি ছিল শেওলা মাখা ;
সময়টা তাই, পেছলানোর গুণ গেয়ে
মনের দরজায় জলছবি এঁকেছিল।

বয়স ছিল ভোরের লাল সূর্য
শরীর ছিল বজ্রের মতো
আপাদমস্তকে টাট্টু ঘোড়ার তেজ
আর মন ছিল হাসনুহানার গন্ধে ম' ম' ।
দিন গিয়েছে সাঁঝের আলোয় মিশে
কত রাতজাগা চোখে রঙীন চশমা এঁটে
মনের অদৃশ্য পাতা ভরেছি জলরঙ দিয়ে ।
আজ সেই বাস্তবের প্যালেটে চাপ চাপ রক্ত
ক্যানভাসে খেলা করে প্রেমিক মাকড়সারা ।
মনের জলছবি গেছে, হিমবরফে ঢেকে
কন্‌কনে ঠাণ্ডার মাঝে বাজে
দরবারী কানাড়ার সুর ।
ভুল করার দিন আজ পরবাসে
সময়টা তাই শেওলামাখা জমি দেখে
শুধুই সাবধান করে ।

শুধু নিশি থাক

গেল বছর রাজগঞ্জের ঘাটে
দিবাকর যেখানে সন্ধ্যার মুখ চুমে
লাল করেছিল লজ্জায়, সেইখানে—
খেয়াপারের পথে প্রথম পরিচয় ।
কাল ঠিক সেই দিনটাতেই
শীতের বুলেটে ক্ষতবিক্ষত শরীরটা
উষ্ণতা পেত তোমার আলতো পরশে ।
হিমশরীর রাতজাগা চোখে নেশা ধরায়,
কাচের গেলাসে মুখ রেখে রেখে—
তৃপ্ত হইনি কতদিন মনে পড়ে না,
তবু সকলের চোখ এড়িয়ে
জীবনের ক্লান্তি ক্লান্ত করে—
তুমি দিলে একমুঠো সুখ,

কথা নয়, শুধু চেয়ে থাকা—;
চোখে চোখ রেখে।
আঁচলে ঢাকা সঞ্জীবনী পাপড়ি মেলে
চোখের অপলক দৃষ্টিতে হেরে,
লজ্জায় রাঙা হল দরজা, জানলা
কুলুপ আঁটল শরীরে।
বাইরে প্রকৃতির বুকে বৃষ্টির দৌরাত্ম্য
ভেতরে আমরা দুজন—;
শরীরময় সুরদাসী মল্লারের সুর
বিস্তারের ছাঁদে ফেলে এগিয়ে চলেছি
শেষে সরগম আর তানের ঢেউ পেরিয়ে
ক্লান্ত শরীরে করুণ ভৈরবীর সুর নিয়ে
কোমল ধৈবত ছুঁয়ে এল ভোর।
বৃষ্টি গেছে নিজের দেশে ফিরে
খোলা দরজা পেছনে রেখে আমি—
শুধু সেই রাত চাই
যে রাতের শেষে আসে না ভোর
করুণ ভৈরবীর কোমল ধৈবত ছুঁয়ে
সুরে সুরে মজে, যে রাত শুধুই
ভোরের স্বপ্ন দেখায়।

মিতা যে শুধুই মিতা

সেদিন যে ছিল ঘোর বরষার রাত
বৃষ্টিবাউল জানলার ঘসা কাঁচে
সুর তুলেছিল রামদাসী মল্লারে
অশান্ত মন উল্লাসে তাই নাচে।
স্নায়ুর নদীতে ব্যথা ঘোড়দৌড়
ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে শিরার রক্ত থেকে
হঠাৎ ভাসে আবছা একটা মুখ
চমকে উঠি উজ্জ্বল হতে দেখে।

উজ্জ্বল মুখ উজ্জ্বল হয় আরো—;
হেসে ভালোবেসে সে শুধু বাড়াল ঋণ
সেই সে 'মিতা'-র শান্ত ও দুটো চোখ
বুদ্ধের মতো স্থির ও পলকহীন।
প্রেম এ জীবনে এসেছিল বহুবার
নরম সুরের কোমল পর্দা ছুঁয়ে,
অবুঝ দুঃখ তাই আসে বারবার
সবুজ মনের স্মৃতিপট চুঁয়ে চুঁয়ে।
অনেক আঘাত সয়ে যবে মনে ভাবি
সঙ্গীনী ছাড়া জীবনধারণই বৃথা,
বহুদিন পাশে সঙ্গীনী বেশে থেকে
পৃথিবীর রূপ চিনতে শেখালো 'মিতা',
বান্ধবী নয়, তবে কি সে তোর ফিঁয়াসে
ব্যঙ্গে শুধায় বন্ধু ও পরিজনে!
কি করে বোঝাব 'মিতা যে শুধুই মিতা'
মিতার আসন মনের বিশেষ কোণে।
ওই দুটো চোখ দেবী শক্তির মতো
মনের দেয়ালে রামধনু রঙ এঁকে
জীবন সুখের আগমনী গান গায়
উদার অসীম মনের গভীর থেকে।
আজ বারবার তোমায় পড়ছে মনে
বরষায় নয়—অঘ্রাণে হিম শীতে,
বৃষ্টিবাউল গাইছে না আজ গান
মন তার আজ ঠুমরী গজল গীতে।

মৃত্যুঞ্জয়ী

জীবনের দিন কেটেছে তুফানে
রাত গেছে দুঃস্বপ্নে
তবুও তো আমি বিজয়-পতাকা
গড়েছি ভীষণ যত্নে।
পথে দেখেছিনু পিছলের রেখা
মনে ছিল সংশয়
তা দেখেও আমি সে পথেই গেছি
এড়িয়ে মনের ভয়।
মৃত্যুর সাথে জীবনের আজ
পাঞ্জার ফলাফলে
জীবনের মুখে উজ্জ্বল জ্যোতি
মৃত্যু নিজেরই কোলে।
সুখের সঙ্গে দুঃখের আজ
মুষ্টিযুদ্ধ থামল
দুঃখের দিন কেটে গিয়ে শেষে
সুখের জোয়ার নামল।
জীবনের দিন কেটেছে তুফানে
রাত গেছে দুঃস্বপ্নে
তবুও তো আমি বিজয়-পতাকা
তুলেছি ভীষণ যত্নে।
আমি আজ তাই 'রাজার রাজা';
দীক্ষিত এই মন্ত্রে
বুঝলাম সার জীবনের শুরু
নীল মৃত্যুর অন্তে।

গরম বুড়ো

শীতের শেষে ঘাড় নাড়িয়ে গরম বুড়ো আসে,
মানুষজনা হাঁফিয়ে ওঠে বোশেখ জ্যৈষ্ঠ মাসে।
পুকুর নদী শিউরে ওঠে হল্‌কা আগুন লেগে,
ডোবার জলও বাষ্প হ'য়ে জমতে থাকে মেঘে।
গরম বুড়োর দাপটে সব লোক ভয়ে থরথর,
সর্দিগর্মি হবেই হবে সঙ্গে হয়তো জ্বরও।
চক্‌ চক্‌ চক্‌ টাকগুলো সব তিরতিরিয়ে ঘামে,
মাথার থেকে পায়েতে ঘাম তরতরিয়ে নামে।
রাস্তা তাতে, পিচ গলে যায়, গরম বুড়ো হাসে
কষ্ট করেও মাসটা কাটাই বর্ষারাণীর আশে।
মরলে বুড়ো বুঝি তখন বর্ষারাণীর দেশ,
দেখি তখন গরম বুড়োর সব দাপটই শেষ।

জোয়ারে দিওনা গা

লাট্টু চেঁচিয়ে বলে, 'আকাশেতে উড়বো'।
ঘুড়ি বলে, 'তবে আমি লেত্তিতে ঘুরবো!'
এই কথা শুনে গরু শিং নেড়ে নেড়ে
সিংহকে খেতে গেল ঘাস খাওয়া ছেড়ে!
কুকুরের দেখি আজ মাংসেতে রুচি নাই,
বেড়ালে খায় ঘাস, দুধ মাছ নাহি চাই!
মানুষও এসব দেখে উভচরে দিলো মন,
গাছের ও তলাকার ফল খাবে আজীবন!
সভ্য মানুষ সব জগতের জোয়ারে
দিচ্ছে ভাসিয়ে গা, দোষ দেবো কাহারে?
সব কিছু জেনে তবু ভুল কেন কররে
মরলে তো যাবে সব শ্মশানে বা কবরে!
তাই যাঁরা গুণীজন বলে গেছে সবারে,
জোয়ারে দিওনা গা — টান নয় রবারে।

কবিতা / ধনঞ্জয় সিংহ

প্রতিশ্রুতি

অজগরের মত শুধু 'প্রতিশ্রুতি' পড়ে আছে
হাসি-ঠাট্টায়, খবরের কাগজে, ভাষণে
তাই বাঁধ-ভাঙা সমস্যার সমাধানের অভাব।

অথচ নিশুতি রাত…পেঁচার ডাক
কচি ছেলের কান্না, চৌকিদারের হাঁক ;
পাঁচতারা হোটেলে অভিভাবকের ভীড় !

'প্রতিশ্রুতি' জ্বলছে……শুধু জ্বলছে……
বেকারীত্ব…হাঁড়িতে মাকড়সার জাল,
ভ্রূণ হত্যা, ইলেকট্রিক শক্, সব চলছে—

কবির মৃত্যু নেই

বিংশ শতাব্দীর আগমন বার্তায় ভাসে
রাষ্ট্রপ্রধানদের মহৎ প্রয়াস—
অস্ত্রসংবরণ ও আন্তর্জাতিক শান্তি।
অথচ বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ার
শ্বেতাঙ্গ সরকার, কৃষ্ণাঙ্গ কবি 'বেঞ্জামিন—
মোলাইজ'কে মৃত্যুদন্ড দিল 'ফাঁসি'।

মানুষের অণু-পরমাণুর উষ্ণ স্রোতে
সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের ঘরাণা।
রাষ্ট্রপ্রধানরা স্বয়ম্বর সমরসজ্জায়
নির্ভীক যোদ্ধা কবি-সাহিত্যিকের
শুধুমাত্র 'কলম'—'কলমের আঁচড়'।

কবির মৃত্যু ? মূর্খের কল্পনা !
অবাস্তব, মূর্খের স্বর্গে বসবাস
কবিরা অবিনশ্বর ! অবিসংবাদিত ইতিহাস !
কবির মৃত্যু হয় না, কবির মৃত্যু নেই।

কাননদেবী স্মরণে

বিংশ শতকের মধ্যগগনের প্রিয়দর্শিনী তুমি
জন্মাবধি শুনেছি তোমার মনমাতানো নাম
শুনেছি মায়ের মুখে তোমার গান
তুমি ছিলে সকলের ভালবাসার মন্দির
আজ তুমি হোলে ইতিহাস। তবে
তোমার হৃদয়গ্রাহী গান বাজছে সবার মননে
তুমি তো শুধুমাত্র সুগায়িকা নও, তুমি
বাংলা চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তী অভিনেত্রী।
চলচ্চিত্র থেকে বিদায় নিয়েছিলে ১৯৬৪ সালে।

১৯২৬ সালে দশ বছর বয়সে নির্বাক চলচ্চিত্রের
যুগে তোমার অভিনয় জীবনের শুরু,—
ছায়াছবির নাম ছিলো 'জয়দেব' আর
তোমার প্রথম সবাক ছবির নাম 'জোর বরাত'।
তোমার সেই জনপ্রিয় গান—'প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম'
আজও সবার মনে বাজছে—বাজবে।

১৯৪৯ সালে শ্রীমতী পিকচার্স তোমারই সৃষ্টি
তোমার গান ও অভিনয় সম্মানিত সবার কাছে
তাই তুমি 'পদ্মশ্রী' পেয়েছো ১৯৬৮ সালে
'দাদাসাহেব ফালকে' পেয়েছো ১৯৭৭ সালে
আর 'ডি-লিট্' পেয়েছো ১৯৯১ সালে।

চিত্র পরিচালকের প্রতি তোমার ছিলো
অগাধ প্রেম, কেননা—তুমি,—তিন যুগের····
বায়োস্কোপ থেকে টকি, টকি থেকে প্লেব্যাক
কানন দাস থেকে কাননবালা, অবশেষে কাননদেবী
তুমি আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী, সুগায়িকা, তোমাকে প্রণাম

নতুন ভারত

চারপাশের ভয়ঙ্কর কালো আকাশ
যেন বুকের ওপর কঠিন পাথরের মত
চেপে বসেছে ; অথচ আমরা স্বাধীন।
কেবল আতঙ্ক আর সন্ত্রাসের তীক্ষ্ম থাবাগুলোয়
মনের ফসল চূর্ণবিচূর্ণ হোয়ে কুয়াশায় ছেয়ে গ্যাছে।
শিক্ষিতরা চাকুরীর জন্য লাইন দিয়েছে কলে-কারখানায়
নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা জপের মালা হাতে কোরে বসে আছে।
মনে হয়, দাসত্বের বেড়াজালে আচ্ছন্ন সব দেশপ্রেম,
তাই দেশের মাটিতে আপনজনের মত বসতে
কেবলই সময় ফুরিয়ে যায়, মানে ·· যন্ত্রণা !

হায় বাঙ্গালী জাতি ! তুমি তো ভীরু নও।
তুমিই তো ইংরেজের কঠিন আঘাত পদদলিত কোরে
ভারতের মানুষকে শিখিয়েছিলে —
'দেশকে ভালবাসার শিক্ষা'।
কিন্তু যেন মোমবাতির ন্যায় আস্তে আস্তে
দেশপ্রেমের আলো ক্ষীণ হোয়ে গ্যাছে। ফলে
রুখে দাঁড়ানোর বাসনা সব কোথায় হারিয়ে গেল ?
কোথায় হারিয়ে গেল নেতাজীর আদর্শে ছাত্রদের দেশপ্রেম ?
আজ কেবল কুড়েমী ও হিংসা যেন সর্পিল গতিতে
এগিয়ে এসে সমস্ত বাধা নিষেধ জলাঞ্জলি দিয়ে
সকলকে বোকা বানানোর নেশায় মত্ত।
সমাজ কল্যাণের ধ্বজাধারীদের বাঁশী
সকলেই শুনেছে, কিন্তু চোখে দেখেনি !
সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দুঃখের সাথী হোয়ে
দুঃখ মোচনের জন্য যারা দিন-রাত ভেবেছে ;
তারাই ক্ষমতা পেয়ে ভুলে গ্যাছে পুরাতনী গান।
দেখছে সামনের সিঁড়িটায় উঠতে যেন হাত-পা
না কেঁপে যায়, কণ্ঠস্বর যেন অপরিবর্তিত থাকে
অতীত দিনের মুখরোচক গল্প শোনাতে।

বাংলার মা, আশুতোষ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের
মত সব বাঘ জন্ম দিয়েছিলো। আজ বড় অভাব।
এ শতাব্দীর মায়েরা কতৃত্ব বজায় রাখার জন্য
আপন মন্ত্র আউড়ে দিনগত পাপক্ষয় কোরছে…

ভারতের মানচিত্র খুবলে খেতে হিংস্র উন্মাদনায়
যে সব মানুষ ফাঁদ পেতে বসে আছে ;
তাদেরকে দমন কোরতে একটুও পরিশ্রম যেন
ব্যর্থ না হয় নব প্রজন্মের ইতিহাস ! সেইজন্য
ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক দল বেঁধে—
গোপন প্রেমের রাজনীতি ভেঙে চুরমার কোরে
গঠন করো নতুন ভারত।

এখনও চলবে

এখনও চলবে—তামাশা, প্রতারণা
শহর, গ্রাম পাহারাদার পোস্টারে,
এখনও চলবে—বোকা বানানো আন্দোলন
দেশ-গড়া খেলা, নেতাদের ভাষণে।
এখনও চলবে—হাহাকার, ধর্ষণ, রক্তপাত
কৃতজ্ঞতাহীন এ স্বাধীন দেশে ;
এখনও চলবে—তুমি—তুমি থাকা
এ অহিংস ভারতবর্ষে।
এখনও চলবে—সকালে সূর্য, রাতে চাঁদ, নক্ষত্র,
শ্রমিকের ঘাম, অশ্রু,
বসন্তের কোকিলের কুহুরব—
যা শাশ্বত সত্য, লেখকের কলমে।
এখনও চলবে—হিংসা, প্রেম, ভালবাসা-বাসা খেলা
সকলের মনে—
হাটে—মাঠে—ঘাটে
এখনও চলবে।

যুদ্ধ চলছে—চলবে

যুদ্ধ চলছে, চলবে।
দায়িত্বে, কর্মে
কথায়, মর্মে
মানুষে-মানুষে
চলছে—চলবে
যুদ্ধ চলছে—চলবে।

বৃষ্টি কবে হোয়ে গ্যাছে
মনে নেই কারো!
কর্মের—যুক্তির
প্রাণের—মুক্তির
মৃত্যুর—বাঁচবার
স্বপ্ন আঁকবার
বৃষ্টি কবে হোয়ে গ্যাছে
মনে নেই কারো!

যুদ্ধ চলছে—চলবে
বুদ্ধিমান মানুষের
মুক্তির মন্দিরে
সতর্ক সাইরেন
অহরহ বাজবে।

নির্বোধ শিশু
ভিখারি যীশু
রাবণের চিতায়
প্রেমের শবদেহ;
দাউ দাউ জ্বলছে
ভালোবাসা ভাঙছে
যুদ্ধ চলবে—চলছে!
যুদ্ধ চলছে—চলবে।

বলতে পারো।

আমার দেশের সবার ঘরে
দুঃখ কষ্টে অশ্রু ঝরে !
নেতার আসন রয় ওপরে
দেশোন্নতি হয় কি কোরে ?

তোমার আমার প্রাণের লেখা
অসময়ে হয় না দেখা !
তাই হৃদয়ে পায় সে ব্যথা,
উন্নতিরই উধাও কথা !

শ্রমিক শ্রমিক ভাই ভাই,
নেতার কথার জুড়ি নাই,
বক্তৃতাতেই মহান সবাই
অভাব শুধু দেশের সেবা-ই ।

ভারতবর্ষের এই তো পুঁজি
দেশের দশের নেতা খুঁজি,
বিদেশী ঋণে বাঁচ্‌ছি আজি
হাল ধরবার নেই যে মাঝি ।

কেউ বা দালাল, কেউ বা সাধু,
রঙ বে-রঙের বদ অ-সাধু !
দৈন্যদশায় সবাই আছি
ভাবনা শুধু কেমনে বাঁচি !

তোমার আমার সবার মাঝে
মুখোশধারী দালাল আছে,
প'ড়লে ধরা দুর্নীতিতে
কৌশল করে মান বাঁচাতে ।

ভদ্রভাবে বাঁচার তরে
ভদ্রশিক্ষা পড়ুক ঝরে
দেশের দশের সেবায় তবে
সবার মিলন হবেই হবে ।

কখন আবার সূর্য্য উঠবে ?

গ্রীলের বারান্দা পেরিয়ে—
সকালের বিছানায় নেমে আসে
সোনালী রোদ্দুর।
সারা রাতের আনন্দকে স্বাগত জানিয়ে
নিয়ে আসে ব্যস্ততার সকাল।
আর নয়, একটু বাদেই
বেরুতে হবে কর্ম্মস্থলে।
তাই, অনুভূতির বালিশ গুটিয়ে
চলে আসতে হয় অফিসে—
এখানে আসে না কেউ
স্বাগত জানাতে।
এখানে আসে সবাই
ফাই-ফরমাস নিয়ে।
দিনান্তে বিদায়ী সূর্য বলে—
চলে যেতে হবে ঘরে।
ক্লান্ত দেহ অবসন্ন মন,
বিষাদের ছায়া নিয়ে
ঘরে ফেরে অভাবের রাত
অপেক্ষায় থাকে—
কখন আবার সূর্য উঠবে।

মৃত্যুর আহ্বান

মৃত্যুর আহ্বানে
জীবনে এনে দিক চরম মুক্তি,
যার প্রতীক্ষায় আমার অন্তর চির উন্মুখ।
আমার প্রবল তৃষ্ণা-আনন্দে ভরে উঠুক
উত্তাল মন, হয়ে যাক পরিতৃপ্ত

অবচেতনার গাঢ় আলিঙ্গনে,
যে কামনা-বাসনা নিয়ে
এ পৃথিবীতে এসেছি
মধ্যাহ্নের সূর্যালোকে যদি জ্বলে যায় !
জ্বলুক তাতে ভয় কিসের ?
আমি মৃত্যুর আবাহন করি
তারুণ্যের পদাঘাতকে হাসিমুখে মেনে নিই
মৃত্যুর আগে চেয়ে নিই সময়
হাতে তুলে নিই শেল, বুলেট
ভেঙ্গে দিই, গুলিবিদ্ধ করি
ঐ অকৃত্রিম পাহাড় আর,
অমানবিক প্রেতাত্মার ছায়াকে
আমার, 'আমিত্বের' অহমিকায়
যারা গড়েছে প্রাসাদ
জীবনবোধের কলিজা নিংড়ে।
তাদের উদ্দেশ্যে পতন নেমে আসুক—
এই গাঢ় অন্ধকারের গা ঘেষে।
আমার শুদ্ধ চিত্ত হোক
মহিমান্বিত চুক্তিতে বিলীন।
আমি—আমার একান্তে
সমাপ্তির উত্তরণে পেঁছে যাব,
জীবন মৃত্যুর অমর প্রান্তে।
সমস্ত অন্তর জুড়ে গেয়ে যাব
মৃত্যুর আবাহনী গান ।

স্বপ্ন হোক সত্যি

এতদিন তোমার বুকে
সুখ লুকিয়ে ছিলাম।
এখন তোমার বুকে
হাত রেখে দেখি
অঙ্কুরের আগমন।

রক্তের ভেতর ছড়িয়ে আছে শিকড়,
আমরা দুজন দুজনকেই
জড়িয়ে ধরে উঠছি।
কিন্তু এ পৃথিবী ছেড়ে
আমাদের একদিন চলে যেতে হবে,
তবু একটা ছোট্ট গাছ
মাথা উঁচু করে উঠবে।
থেকে যাবে, রয়ে যাবে
আমাদের স্বপ্ন—দৃঢ় অঙ্গীকার।

ওরা ফিরে যায়—ফিরে আসে

ওরা এসেছে····
বিপ্লবের বার্তা বহন করে
বরফে ঢাকা শীতের রাতে
ওরা ঢেকেছে এক ফালি কাপড়ে
সভ্যতার উলঙ্গ শরীরটাকে।
ওরা এসেছে ···
বহুদূর থেকে,
কয়েকশো ক্রোশ পেরিয়ে
শহীদ মিনার ঘেষে
রাজপথ ধরে ব্রিগেডের পথে।
ওরা এসেছে····
প্রতিশ্রুতি আদায় করতে
জীর্ণ শরীরে এনেছে সাহস
বিদীর্ণ করেছে আকাশ
মিছিলের পদধ্বনি আর স্লোগানে
ওদের অপরিকল্পিত বাগানে
খুঁজে বেড়ায় শিল্পীর দু'নয়নে
পরিকল্পনার ব্যর্থতা ওদের জীবনে
বার বার আসে! নিভৃতে কেঁদে।

তবু ওরা আসে····

প্রাপ্য পাওনা মেটাতে
দুঃস্বপ্ন নগরী ওদের পানে তাকিয়ে
শুধু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে।

ওরা ফিরে যায়····

চোখে মুখে ক্লান্তির অবসাদ নিয়ে
সেই পোড়া ঘর, মাটির বাড়ি
থাকে ফের নির্জনে একাকী।

ওরা ফিরে যায় ··ফিরে আসে—

প্রস্তুতি নিয়ে আজ ঘরে ঘরে
শীতের ছেঁড়া কাপড় ছুঁড়ে ফেলে
ছুটে আসে যোদ্ধার বেশে
যুদ্ধক্ষেত্রে শাণিত হাতে
সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত হলেও
নামাবে ওরা অকর্মণ্য বাদশাকে
ওই সুসজ্জিত ঘোড়া থেকে।

আমি তোমাকে চিনি

তেত্রিশ বছর ধরে পথ হেঁটেছি আমি—
আজ আমি ক্লান্ত স্মৃতির এ্যালবামে।

বেঁকে গেছি আমি—
রামধনু সম কখনও,
উত্তর দক্ষিণে অথবা
পূব থেকে পশ্চিমে।
কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী
পায়ে পায়ে হেঁটে,
পায়ের গোড়ালিতে—
রক্তাক্ত ফাটল নিয়ে চলেছি আমি
ক্ষয়হীন এ মাটির বুকে।

রাজপথে দেখেছি আমি
কঙ্কালসার মানুষের মিছিল
ভোর থেকে সন্ধ্যে অবধি
বুলেটের কঠিন আঘাতে
স্তূপীকৃত মৃতের জঞ্জাল।
কিন্তু মিছিলের শেষে—
দেখেছি আমি সত্যের স্বপ্ন।
অনেকেই পরে আছে শহীদবেদী হয়ে!
স্বাক্ষর রেখেছে ওরা
সত্যের পূজারী হয়ে।
আমি কোটি মানুষের—
আমিও একজন
আমি চিনেছি তোমাকে
রক্তের ঘামে, অশ্রুর বিনিময়ে।
আমি দেখেছি এখানে—
নারীকে পণ্য হিসাবে
চড়া দামে বিক্রী হতে।
আমি দেখেছি—
ধর্ষিতা নারীর রক্ত
এ ধরণীকে কলুষিত করে।
আমি দেখেছি—
বহু শত কাঁচা ফল
কারবাইডে পাকে।
তাদের ঈপ্সিত হাহাকার
ভারতের বাতাসকে কলুষিত করে।
সন্ধ্যার পর রাত্রির অন্ধকারে
স্মৃতির অ্যালবাম খুলে
চিনেছি আমি—
আততায়ীকে!
কাঁচা রক্তের স্রোতে
পা টিপে টিপে

ছুঁড়ে দেব আমি শেষ অস্ত্র
ঐ রক্তপিপাসু শকুনের দিকে
আর ভারতবাসী!
বন্ধ্যার বাঁধন খুলে
পরে নেবে যুদ্ধের পোষাক
রাইফেল হাতে শুরু করবে
মাতৃবন্দনার গান।

অসহায়ের কান্না

পাশের বাড়ীর অবোধ শিশুটি
'বাবা-বাবা' বলে ডাকে।
ও'যে জানে না—
ওর বাবা বিনা অপরাধে
পড়ে আছে আজও জেলে।
স্বপ্ন ছিল ওর বাবার
ছেলেটি আমার এ সমাজে
সুযোগ্য সন্তান হবে।
রক্ত ঝরিয়ে অশ্রুর বিনিময়ে
করছিল কাজ এক মালিকের কাছে।
হঠাৎ মালিকের কাজ বন্ধ হল
তালা পড়ল তার গেটে।
নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিল—
"বন্ধ করেছি বিদ্যুৎ-এর অভাবে"।
অভাব অভাব আলোর অভাব
তাই, অন্ধকার নামল
ঐ শিশুটির ঘরে।
শিশুর বাবা দিশেহারা হয়ে
কাজের সন্ধানে ঘুরে ফেরে রাজপথে।

হঠাৎ চোর ভেবে করল ধাওয়া
যারা নিজেদের স্বজন ব্যক্তি বলে।
চোর তো পায়নি,
পেয়েছে পথচারী
অপবাদ দিয়েছে চোর বলে।
কিল চড় লাথি ঘুষি
নিয়ে গেল শাসকের কাছে
ঐ শিশুর বাবা বার-বার বলল
আমি চুরি করিনি ওগো।
মিছে অপবাদ দাও কেন ?
শুনল না ওরা—
নিয়ে গেল বিচারকের কাছে।
স্বাক্ষী হিসাবে নেই যে কিছু,
তাই জেলখানাতে ঢোকে।
অসহায় শিশু বোঝে না কিছুই
শুধু বাবা-বাবা বলে কাঁদে।

খড়্গ যাদের ওপর

বন্ধু হত্যাকারীদের ক্ষমা করবো না—
ক্ষমা করবো না ধর্ষণকারীদের !
খালি হাতে চলবো না
পুষ্পাঞ্জলি হাতে নিয়ে।
হাতে নেবো কঠিন কুঠার
শক্ত মুঠে ধরবো আমি শাবল।
যেন কোনদিন —
কোন জানোয়ার—
আমার মা বোনদের
রক্ত আর ঝরাতে না পারে !

ভুখা মিছিলে আমিও একজন

যৌবনের ভুখা মিছিলে
সামিল হতে চাই নি।
তাই তো রাতের শয্যা ছেড়ে
নেমে এসেছি ফুটপাথে।
যেখানে যৌবনের ব্যর্থতায়
কফিনে সাজানো
যুবতীর হাড়ের সারি,
সেখানেই সামিল হই আমি।
এ পথে ঘুমন্ত সবাই।
যেন এক একটি শব।
ফুটপাথের পাশে আলোকিত ঘর
স্বর্গীয় সৌরভে ভরা,
অথচ পাতাল অন্ধকারে
আমাদের এই ফুটপাথ জগৎ
ভাবিনি কখনও মৃত্যুর কথা।
তবু রাত একটার পর,
নিঃস্তব্ধ অভাবের রাতের যন্ত্রণায়
চিৎকার করি একা—
যৌবনের ভুখা মিছিলে
প্রতীক্ষায় থাকে যেন কারা।

কবিতা / প্রকাশ সেনগুপ্ত

প্রার্থনা

গভীর রাতের হে নৈঃশব্দ্য !
তোমায় আবাহন করি—
পৃথিবী ভরা হানাহানি
মানুষে মানুষে কুৎসার
বিষ-বাষ্প—ক্লেদাক্ত হৃদয় !

দিনের পর দিন জাবরকাটা,
রোমন্থন প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট···
যেন এক শ্বাপদ-সংকুল গহীন অরণ্যানী।
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা
সবই মুখোশধারী ভেক্।

নির্জন ঘাস-বিছানো কার্পেট মোড়া
পথ দিয়ে আসতে আসতে
শান্ত-রসাস্পদ তপোবনের
কথা মনে পড়ে যায় !

রাতের নিস্তব্ধতা খান্‌খান্ করে
আলোর বন্যা বইয়ে
যে ট্রেনটা সগর্জনে চলে গেল—
সেও কি যুগ-যন্ত্রণায় বিদ্ধ !

অন্ধকারের মাঝে জ্বলুক আলো
প্রদীপ শিখা হোক নিবাত নিষ্কম্প।
ভীরু হৃদয়ের বুকে যেন
আমার ধ্রুবতারা জ্বলে···
অমৃতস্য পুত্রদের মনে
সূর্যমুখীর শাশ্বত প্রতীক্ষা।

সময়

সময়ের দাম দিয়ে, নিজেকে বুঝেছি—
অজেয় সম্মানের পসরা,
ধুলোয় লুটিয়ে দিল যারা
সেই সব অধরা, চিরছলনার
রঙ্গীন ফানুসে মোড়া—ঠুনকো
মানের দাম ?   দুরাশামাত্র !
অজানা রহস্যের আবর্ত্তে
মনে পড়ে হরেক ইভের মিছিল !
জীবনকে যারা দুমুঠো
ঝরা বকুলের মত ছুঁড়ে দেয়
আর নিঃশেষে দহন করে—
আগামী দিনের তরতাজা প্রাণ !

দেখেছি আমি, কত স্বপ্না, চন্দনা
কত বিপাশা, অরুন্ধতী
কত আশা কত স্বপ্ন
কত গাছ ফুল-পাখি ছায়া
দীপ্তিহীন দহনে পুড়িয়ে দেয়....।
থরো থরো কুমারীর প্রথম
ভীরু প্রেমের মতন দুরন্ত অবক্ষয়—
ভাঙ্গা বাঁধ পলিতে সব
ভরাট হয় ; শুধু সময় ।

অধরা মাধুরী

কোনও এক জ্যোছনা রাতে
পৃথিবী ছিল আধেক ঘুমে—
রাতচরা এক ডাহুক ডাকে
বসন্তের মাতাল হাওয়ায়
কোকিল যেমন রাগ ছড়ায়

ভালোলাগার রেণুগুলি
তখনই পাপড়ি মেলে।

মেরুজ্যোতি দেখিনি কখনো
নিশীথ সূর্যের অধরা মাধুরী
সুন্দরের দরজাগুলো
চিরদিনই ছিল অদেখা-অচেনা।
আজ মুক্ত বিহঙ্গী যাত্রী আমি!
'সালারজং'—কবি-কল্পনার
সুদূর বন্ধন, শ্রদ্ধার আবেগে
মাথা নত হয়ে যায়।

ভ্রমণবিলাসী কৃতি পুরুষেরা
অনেক কিছুই দু'চোখ ভরে দ্যাখে ;
কিন্তু সৌন্দর্য-পিপাসু অনুভূতিপ্রবণ
মন ; কোথায় পাবো তারে ?
এক জনমে পার্থিব সম্পদ
আহরণ করে পরিবেশন করা
অকল্পনীয় ব্যাপার মনে হয়।

পাথরের বুকে পদ্মফুলের মত
'সিক্তবসনা সুন্দরী'
অপূর্ব এক কাব্যসুষমা ;
প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমন্বয় জীবন্ত
কাঠ, চিনামাটি, পোর্সোলিন
গালিচা, যেদিকেই চোখ ফেরাই—
বিস্ময়-অবাক-বাকরুদ্ধ
পথিকের ঘোর তবুতো কাটে না।

মেঘ ছায়া হয়ে

দিনের পর দিন চলে যায়
মেঘ ছায়া হয়ে—।
জীবনের কুহেলীভরা দিনগুলি
কোথা যে হল উধাও !
তোমার হিসেব-নিকেশের পশরা
থামিয়ে একটু এগিয়ে তাকাও
চার দেয়ালের বাইরে খোলা আকাশ
সেখানে—জানলা দিয়ে নয়
বাইরে দেখ এবার সব কিছু।

চারদিকে লেলিহান শিখা
পৃথিবীটা কি দারুণ পুড়ছে····
মারছেও অগণিত হতভাগাদের···
যারা অন্নবস্ত্র বাসস্থানের জন্যে
হন্যে কুকুরের মত ছুটে বেড়ায়··
তাদের শরিক হয়ে
একটু মুখোমুখি দাঁড়াও !
জীবন-মৃত্যুর আঁচড়—
একটুও দাগ পড়বে না
যদি না সামিল হও এক সাথে।

চাঁদিপুরে

এখানেও তো দেখি, অসীম নৈঃশব্দ্যে
ঢেউগুলো করে খেলা—
ঝাউ-এর ফিস্‌ফিসানি আর
হাওয়ার শোঁ শোঁ শব্দে
বালুকারাশি মিতালী পাতায়—
ক্ষণিকের অতিথি ঝিনুক কুড়ায়।

পায়ে পায়ে যাবে কত দূরে—
এই হিরণ্ময় নিস্তব্ধতায় ?
অদূরেই বুড়িবালামের মোহনা
ইতিহাসের নীরব সাক্ষীর মত—।
নীল নির্জন সাগর দেখার
বাসনায়, জাগর রাত্রি তো কাবার।

অজস্র রংবাহারী ফুল
গাছ পাছালি ভরা বনবীথি ;
নয়নশোভা কটেজগুলিতে
ভিড় জমায়—
আতিথ্যে তৃপ্ত অতিথিরা
শান্তির কুলায় নেয় বিশ্রাম।
সূর্য ডোবার পালা শুরু
এলাম কি তবে মার্সেই বন্দরে ?
বলরামগুড়ির বুড়িবালামে
শত শত মাছধরা নৌকা····
ট্রলারের অবিরাম পদধ্বনি—
এমন চাদনীরাতে স্তব্ধ চরাচর ঘিরে
পাগলপারা সমুদ্রতীর,
যেন অজস্র অভ্রের কুঁচি
বিছিয়ে দিয়েছে, তোমার কূলে, চাঁদিপুরে

আলোতে ছায়াতে দিনগুলি

এ এক আরণ্যক সবাক চিত্র ;
আলো আঁধারির আবছা আলোয়
পুরানো দিনের স্মৃতির মিছিলে
ভীড় জমায় যত অশান্ত হৃদয় !
এখানের নৈঃশব্দ্য মিঠে রোদ্দুরে
পিঠ দিয়ে কত করেছি উপভোগ ঃ

কখনো তা খান খান হয়ে ভেঙ্গেছে
দূরাগত ট্রেনের সশব্দ গর্জনে
তবুও ভাল লাগে ভাল লেগেছিল
একাকী নির্জন পুকুরে দাঁড়িয়ে থাক্তে।
আমি যেন এক সিন্ধবাদ নাবিক,
কূলে কূলে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মাঝে
হাল ধরে আছি শক্ত হাতে,
মাঝে অনেক বন্দর, জনপদ ঘুরে ঘুরে
হরেক রকমের সঙ্গে পরিচিত হয়েও
কাউকে ধরে রাখতে পারিনি হৃদয়ে।
এ বন্দরের কাল হলো শেষ
পাতায় ছাওয়া কুটিরের হাহাকার,
বাজবে বুকে চৈত্রদিনের ঝরা পাতার মর্মর!
হঠাৎ শুনি দূরাগত উৎসব ধ্বনি;
আলোতে ছায়াতে দিনগুলি ভরে রয়
তুমি শুধু আমার একাকী!

ইছামতীকে

অনেক বহতা নদীর মতো
এখানেও অসীম নৈঃশব্দ্য!
শীর্ণা ইছামতী তোমার কূলে বসে
ক্ষুব্ধ মনের অপার শান্তি জুড়োই—
পিপুলবেড়-ভাজনঘাট-টুঙ্গীর
জনপদের অক্লান্ত আনাগোনা
এ নদীর বুক চিরেই—সড়ক সেতুর ওপর!
নিস্তরঙ্গ জীবনের অস্ফুট কল-কাকলি।
দুই তীরে আদিগন্ত ধান, শষ্য ক্ষেত····
আপক্ক গাছ যেন সবুজের মায়া ছেড়ে,
কাঁচা হলুদের মত হলুদ রঙ হ'য়ে

ঝুঁকে পড়েছে যুবতী নারীর মত—
প্রাপ্তবয়স্ক রবিশষ্যের গোছা বাঁধতে
ব্যস্ত যুবা-বৃদ্ধ !   কেউ বা ক্ষেতে
লাঙ্গল-বাঁশিই দেয়—মহোৎসবে ।
এপার-ওপার, গ্রাম-গঞ্জে ঝিঙে-
পটলের ব্যাপারীর আনাগোনা....
যাদের জীবনে অনন্ত কাল ধরে
চলেছে একঘেঁয়েমির পশরা ।
ডিঙ্গি সাল্‌তি চেপে খ্যাপলাজাল ফেলে
উদয়াস্ত চারপ্রহর শবরীর প্রতীক্ষা ?
ক্ষীণ বুকের রস নিঙড়ে দিন গুজরানোর চেষ্টা !
এক নিটোল গ্রাম্য ছবির মতো—
কত না ইতিহাসের নীরব সাক্ষী তুমি ।
অদূরেই জলঙ্গী, চূর্ণি হাতছানি দেয়
বকের ক্লান্ত ডানার শরিক হতে ।

ইচ্ছা তো সব প্রভুর

গত সনে পাট বুনে ভাই
হাড়ে গজিয়েছে দূর্‌বা,
চাষীর পো চাষ করে খাই—
সমাজে গরীব গরবা !

পাট সনে আলু বুনেছি
হয়েছে ফসলও, দেদার
ব্যাপারী কয় সব বুঝেছি
শোধ কর্‌ আগে ধার।

মেওয়া ফলে ঠিক সময়ে
করো না ভাই সবুর ;
আলু-পাট যা কিছুই বোনো
ইচ্ছা তো সব প্রভুর ॥

জিজ্ঞাসা

অনেক নক্ষত্র সবুজ সতেজ,
অনেক তারকাই মৃত—
পৃথিবীর অনেক দলিত মানব
বেঁচে থেকেও জীবন্মৃত।
শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটে
গ্রহ তারকার মিছিলে ;
হাজারো মানুষের অপার জিজ্ঞাসা
অফুরান ; বিপ্লবে তুমি কি ছিলে ?
অনেক শব্দ কলমের মুখে ভীড় জমায়
অনেক আশা ছিল কবোষ্ণ বুকে
দুরন্ত জীবনের হৃদস্পন্দন জানাবো তোমায়
বন্ধু তোমরা, যারা আছো সুখে !
জীবন যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত—
কাটা সৈনিকের রোমন্থন ;
হাহাকারে বাসুকীর ফণা !
যেন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত এ মন্থন।

আকাশভরা সূর্যতারা

(জর্জদাকে নিবেদিত)

কালের করাল গ্রাসে অবশেষে
স্তব্ধ হলো বিশ্বভরা প্রাণ ;
আসমুদ্র হিমাচল কণ্ঠে সেই
উদাত্ত গান, 'আকাশভরা সূর্যতারা'···
আজ কোথায় সেই মরমিয়া শিল্পী
যে নিজস্ব ঋজু গভীর উচ্চারণে
গান গায়, 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু····'।
মেঘের 'পরে মেঘ জমেছিল ঠিকই—
'একে একে নিভিছে দেউটি'।

বিস্ময়ের নীরব আকৃতি ঝরে পড়ে
শিউলি ফুলের মত। ‘তুমি রবে নীরবে....’
ব্রাত্য জীবনের এ এক রুদ্ধ সংগীত।
ক্লান্তি হাহাকার কাকে ক্ষমা করে ?
হায় ! মুকুটহীন সম্রাট্
শুধু রেকর্ডেই কি অমর রবে ?
এখনও আমার মনে সেই সব
উজ্জ্বল স্মৃতি, —অম্লান, অস্ফুট্
ধীর উদাত্ত কণ্ঠে, ‘সোনার হরিণ চাই
আমার সোনার হরিণ চাই... ।’

সব আমদের ওঝা

এসো তুমি এসো ফিরে
রয়েছ কেন দূরে।
বিশ্ব যদি এগিয়ে চলে
তুমি কেন মুখ ঘুরে !

সমাজ সভ্যতা আর
ডিস্কো-ওয়ে-পপ, —
পৃথিবীটা বদলে গেছে
নোট করো এসব !

কে তুমি ? বার্বরি চুলে
আগামী দিনের আঁতেল ?
রুপোলি কিউবিজমে
বোদ্ধারা সব ঘায়েল !

সুস্থ-সবল তাজা
প্রাণে, এসো তুমি এসো —
সব আমাদের ওঝা
তুমি একটু কাছে বসো !

বাসভ্রমণ

কানে পরেছ ঝুমকা
যাচ্ছো কোথা ? দুম্‌কা ?
দুম্‌কা নয়গো দেওঘর—
সেথায় মেলে খাসা বর।
আরো দূরে পোখরা
খাও তবে আলুবোখরা
পোখরা হয়ে ওই নেপাল
ছড়ার হাওয়া লাগছে পাল।
নেপাল কোথায় ? কাঠমান্ডু ?
নয়! তবে কি ধার-মান্ডু ?
ফিরবে কোথা ? বুদ্ধগয়া ?
ঘুমের দফারফা, ভায়া!
গা-গতরে দারুণ ব্যথা
এত সুখ পাচ্ছো কোথা ?
বাহন তোমার বিদেশিনী
ঝকঝকে দাঁত সুহাসিনী
ভ্রমণ আমার শুনলে তো ?
গায়ের ব্যথা ভুললে তো!

একলা পথে

পথ একা আমি একা,
তবু রোজ হয় দেখা!
কালি একা কলম একা
তবু হয় কত লেখা!
পথিক আমি একা চলি
সাথী পেলে কথা বলি!
পথ আমার লাগে ভালো
একলা পথে লক্ষ আলো।

সম্প্রীতির ছড়া

শালুক কিছু ফুটেছিল
রহিম চাচার নহরে,
কিছু পদ্ম প্রায়ই ফোটে
শ্যামকাকুর দহ-রে।

রাম-রহিমে ভাবছিল
ঈদ-পুজো-পার্বণে—
হঠাৎ সেথায় কালো মেঘ
ঘনাল সেই অঙ্গনে।

এ দেশ তোমার, এ দেশ আমার
এক সে মহাকাশ;
বিভেদের ঐ ভাঙো বেড়া
রক্ত যে সব লাল!

একই আকাশ, একই বাতাস
একই স্নিগ্ধ বাড়ি;
ভাইয়ে-ভাইয়ে মুখ দেখি না
কত দিনের আড়ি!

আজব গজল

আবুল ফজল গাইলে গজল
শহীদ মিনার দুলতে থাকে;
সূয্যি মামা দিয়ে হামা
ভৈরবী রাগ শুধুই আঁকে।
পিসায় হেলান দিয়ে ঠ্যাসান
ঝিঁঝি পোকা কী গাইছে হায়;
সিম্ফোনিয়ান বাখ বিটোফেন
আইফেলটা ঝুলছে হাওয়ায়!

কলকাতা ৩০০ / নিধুবাবুর টপ্পায়

কলিকাতা চলিয়াছে
নয় সে অচল
ছল্ ছল্ ভাগীরথী
বলে চল্ চল্ !

এ চলায় জমে ওঠে
কত কথকতা,
ছড়ানো ছিটানো সব
পাবে যথা তথা।

টপ্পার রাজা নিধু
বাবুকেই বলি,
কলিকাতা বন্দনা
নিয়ে তার কলি—

"ভালবাসিবে বলে
ভাল তো বাসিনি
তোমায় দেখতে আমি
দেখা দিতে আসিনি।"

আধুনিক ছড়া

হাফজান্তা আর হাফ আখড়াই
দু'য়ে মিলে সব চলে বড়াই !
তবু যশপ্রার্থী সবে করি উমেদারী
তিনি সব আর তার গুরু-গিরি !
চাটুকার-উমেদার বা শিষ্য-প্রশিষ্য
আধুনিক ছড়ার জেনো এই ভবিষ্য !

কবিতা / আলো সেন

মা'র স্মৃতি

মাগো,
কোথাও যেও না তুমি—
এইখানেতেই থাকো।
এখনও যে ইচ্ছে জাগে
তোমার পাশে শুতে—
বড় মায়াবী স্পর্শ সে যে !
নিশ্চিন্ত নির্ভয় আশ্রয়—
গাঢ় ঘুমে বুজে আসে চোখ
নেই কোন দেয়া নেয়ার পালা…
স্বার্থের কলুষিত মন
পরিশোধের সংবর্ত।
মাঝরাতে চাঁদের আলোয়
ভালবাসা মাখামাখি
তুমি আর আমি।
মাগো,
কোথাও যেও না তুমি—
এইখানেতেই থাকো !

ডাকে—কিন্তু কেন !

ক্ষণে ক্ষণে হাতছানি দিয়ে
কারা যেন ডেকে যায় !
ওরা কি একই লোক ?
না, ওদের মধ্যে আছে অন্য কেউ—
কিংবা খলনায়ক ?
কেহ তো অপেক্ষা করে না—
শুধু ডাক দিয়ে চলে যায়।

বেছে নেয় নিশ্চয়ই পথে কোন সঙ্গী
তবু কেউ তো ফেরে না।
ফিরলে জেনে নিতাম—
তাদের মনের খবর।
কিন্তু কোন প্রশ্নের উত্তরই
পাই না তো আমি।
প্রশ্ন এক সাংঘাতিক—
জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে যায়!
তবুও আমিতো যাইনি এখনও—
এই ঘেরাটোপ ছেড়ে!

দেখে নিতে চায়

সবাই দেখে নিতে চায়
অফিস ফেরতা ব্যস্ত মানুষটিকে!
ঘর থেকে বেরুবার আগে
ঘাড় উঁচু ইতিউতি
আঁকাবাঁকা মুখে
সব দেখে নিতে চায়।

মানুষের বড় আশা
আমিও দেখছি
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব
মুখ, নাক, চোখ, ঠোঁট
কত কিছু লেখা আছে মুখে!

মনের গভীরে ভাষাবাহী
মানুষের মত আকর্ষণী জীব
আর কিছু আছে কিবা
মানুষের কাছে!

প্রতিবিম্বে মুখ

তুমি আছো তাই
সবই আছে সার্থক হয়ে
গোলক ধাঁধায় পড়ে
কত যে সময় বয়ে যায়
নদীর প্রবল গতিতে
দূর সাগরের পানে !

আমি কেন ফিরি তবে
মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টাধ্বনি
মৃদঙ্গের বোল
সুন্দর ললিত কণ্ঠে
প্রার্থনা আরতি।

ভক্তের নিবিড় দর্শন
আমাকে করেছে লোভী।
চকিতে হেনে গেল বিদ্যুৎ
সে আলোয় দেখা যায়
প্রতিবিম্বে মুখ।
তুমি আছ আমি আছি
সব আছে সার্থক ভুবনে।

এখন দেবার সময়

কোটি কোটি বছর শুধু নিয়েছি
এবার দেবার পালা।
নিও সব উপহার
যা দিচ্ছি তোমাকে !
সবই তোমার হোক, কারণ
এখন শুধু দেবার সময়।
ধরেছো বাড়ায়ে দু' হাত আমার
আমি তো ধরিনি।

এখন আমার ধরার সময়
তাই খুঁজে খুঁজে ফিরছি—
আজ পেয়েছি কিনারা
ও মুখ রেখো না ঘুরিয়ে
এবার আমার দেবার পালা !

জানি না কার অভিশাপ

উজ্জ্বল নির্মেঘ দিনে
    পথে দেখা যায় কালসাপ
    জানি না কার অভিশাপ !

উপেক্ষিতা ঊর্মিলার ?
তা হোক ।
অভিজ্ঞতা অনেক হয়েছে
এই ঢের ।
চিনেছি সকলকে
কুটিল ক্রুর-বক্র হাসি
    তেরছা দৃষ্টি ।
আপনি নত হয়ে আসে মাথা
লজ্জায় !
ওরা কারা ?   ভাই কিংবা স্বামী
অথবা আদরের স্নেহের দুলাল ।
ভুলে গেছে সে-ঘরের কথা !
নিয়মের ব্যতিক্রম সরীসৃপ,
ফণা তোলে কালসাপ
    জানি না কার অভিশাপ !

কাঠকুড়ানী মেয়ে

গাড়িটা ছেড়ে দিল
ওঠা হলো না
যাওয়াটাও তাই আটকে গেল।
দাঁড়িয়ে রইলাম বেড়ার ধারে—
হাতে অনেকটা সময়।

পাশে ধূ ধূ মাঠ
চড়া রোদ্দুর হামাগুড়ি দেয়,
বাতাস থমকে যায়
শুকনো হাড়ে কাঁপুনি লাগে
তির তির করে।
ক্লিষ্ট, ক্লান্ত কাঠকুড়ানী মেয়ে
ফিরে আসে স্টেশন চত্বরে
নিজের ঠিকানায়,
বয়স মাত্র তিরিশ।

ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফাঁকে
মুখ ভ্যাংচায়
গায়ের কালসিটে দাগ
মাথার রুক্ষ চুল
সূর্যকে হার মানায়,
ক্ষিদের আগুনে পুড়ে যায়
জন্মের ইতিহাস।
হাড় জিরজিরে দেহটা
বিদ্রোহ করে
চোখদুটো ঠিকরে আসে বাইরে
কাঠকুড়ানী মেয়ে মুখ ঢাকে দু'হাতে

সারাটা বুক জুড়ে
গোঙানি শব্দ ওঠে,
তবুও কাঁদে না অভাগী
কোনদিন হাসতে পারেনি তাই।
আমার দু'হাত দূরে
বেড়াটার গায়
জীর্ণ ঝুপড়ি ওকে হাতছানি দেয়
স্থবির পা দু'টোকে টেনে
রোজকার মতো আজও ঢুকে পড়ে
কাঠকুড়ানী মেয়ে।
হাত খালি, কলসী শূন্য
দিনের সংগ্রহ শুধু
বাড়তি একমুঠো লাঞ্ছনা।

দিন গড়িয়ে যায়
নিয়তির ঘণ্টা বাজে
সায়াহ্নের ইশারায়—
কাঠকুড়ানী মেয়ে ঢলে পড়ে
ঝুপড়ির আঙ্গিনায়।

অগুনতি মানুষ
স্টেশন ছুঁয়ে আসে যায়
খবর রাখে না কেউ
রাখার কথাও তো নয়,
ওরা যে মনে করে
পৃথিবীটা ওদেরই একার।

সব শেষ হয়, হয়ত বা শুরু ;
কাঠকুড়ানী মেয়ের
মরা চোখের তারায়
লেখা থাকে বঞ্চনার গাথা
শুষ্ক অশ্রুর ধারায়।

আমি ডাকি, ফের ডাকি—
আমার ডাকের সাড়া নেই কোন।
বাতাস বড্ড ভারী,—নৈঃশব্দ্য, হাহাকার।
ঝুপড়ির ভেতর শুধু
সেই ক'টা পুরানো কথাই বাজে—
'বাবু তোমাকে সেলাম।'

পদধ্বনি

শৈলী আর কাঁদে না
কেঁদে কেঁদে শেষ হয়ে গেছে
সবটুকু চোখের জল।
রক্ত ধরছে পা দিয়ে
তাজা রক্ত, অনর্গল।
দাগ কেটে কেটে
ঘা করেছে গিল্‌টি করা
হাজার বছরের শৃঙ্খল ;
তবুও আর কাঁদে না শৈলী।

দিশারী সূর্য কখন ওঠে
কখন ডোবে
দাওয়ায় বসে
জীর্ণ পাটাতনে শুধু
হিসেব লেখে তার।

ভোরের আকাশ
কাদামাটি মাখে
ঘোলাটে মধ্যাহ্ন নিংড়ে
ঝড়ের সংকেত আনে
বিকেল বেলার বাঁশী।

তালা পড়ে যায়
দেউড়ীর সিংহদরজায় ;
বস্তীর মেয়ে শৈলী
ছেঁড়া মাদুরের আবডাল তোলে
ভাঙ্গা জানালায়
বাঁচার তাগাদায়—
আমি স্থির হয়ে দেখি।

কান্না-ভেজা রাত
ইতিহাস লেখে সবিস্তারে,
কথা তুলে দেয়
প্রাচীরের বোবা মুখে,
ছকে বাঁধা জীবন
এলোমেলো হয়ে যায়
প্রতিটি মুহূর্তে।
শৈলী আঁতকে উঠে কথা বলে।
ওর কথা শেষ কথা হয়ে
ছুটে আসে সীমানা পেরিয়ে
দেশ থেকে দেশান্তরে—
স্তব্ধ হয়ে আমি শুনি।

সহসা সাইরেণ বাজে
মিনারের মাথায়
বুনিয়াদী ভাবনার ভিত
টলে যায় সীমাহীন আতঙ্কে—
আমি এগিয়ে চলি—
আমার পায়ের শব্দ
মিশে যায় পদধ্বনির স্রোতে।

মা তোমাকে মনে পড়ে

মা তোমাকে মনে পড়ে।
'ছোট্টবেলার দিনগুলো
আমাকে ছাড়তে চায় না কিছুতেই।
জীবন্ত হয়ে ওরা
জড়িয়ে আছে আমার স্মৃতির পাতায়,
নিখুঁত, নিরন্তর।
শীতকালের শেষ বিকেলে
সূর্য যখন নীলাঞ্জন রেখায়
লুকোচুরি খেলতো,
আকাশের গায়ে
গোধূলি রঙ ছড়াতো আলতো হাতে,
পাখিরা ফিরে যেত
ক্লান্ত ডানায় ভর দিয়ে দিয়ে,
ঠিক তখন তুমি এসে বসতে
দু'টো বাড়ির সীমানায়
দিনের কাজ শেষ করে।
আমি খেলতাম পাশের উঠোনে
কানামাছি ভোঁ ভোঁ।
দেখতে দেখতে আঁধার নামতো
গোয়াল ঘরের
চালের তলায়—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।
চামবাদুড় হোঁচট খেতো
কলাঝাড়ে মোচার গায়ে,
ঘুঘুরো পোকা গান ধরতো
ঘর্ঘরিয়ে, বন বাদাড়ে।
ছুটে গিয়ে আমি তখন
মুখ লুকোতাম তোমার কোলে
নিরাপদ আশ্রয়ে।
মা তোমাকে মনে পড়ে।

বর্ষার দিনে যখন
ম্যালেরিয়ায় ভুগতাম,
ফুটো ছাদ দিয়ে
জল চুঁইয়ে পড়তো আমার বিছানায় ;
পুকুর পাড়ে
সজনে গাছের ডালে
কাক ডাকতো কর্কশ স্বরে।
আমার জ্বর বেড়ে যেত—
এক টুকরো ছেঁড়া কাপড়ে
তুমি জলপট্টি দিতে
আমার কপালে সারাক্ষণ ধরে।
মা তোমাকে মনে পড়ে।

অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিধারায়
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতো,
ডোবার জলে ব্যাঙ ডাকতো
গলা ফাটিয়ে।
ঝড়ো হাওয়ায়
বাঁশ ফুলের পাপড়িগুলো
ভেঙে ভেঙে পড়তো চলন পথে।
উনুনে হাঁড়ি চড়তো না
চাল বাড়ন্ত বলে।
খই মুড়িটুকু সবাইকে দিয়ে
তুমি থাকতে উপোস করে।
মা তোমাকে মনে পড়ে।

বাঁশ বাগানের বোবা গলিতে
শিয়াল ডাকতো শেষ প্রহরে—
আমার ঘুম ভেঙে যেত।
নিদ্রাহীন ব্যথাভরা
তোমার চোখ দুটো

আমার কাছে তখন
ধরা পড়ে যেত,
তোমায় ডাকতাম
কান্না চাপা কণ্ঠস্বরে।
মা তোমাকে মনে পড়ে।

মাঝে মধ্যে
তুমি যখন অসুস্থ হতে
উদ্বিগ্ন রাতের
গোড়া ধরে নাড়তাম।
ফুল পড়তো না
ফল পড়ে যেত।
ভোরের কুহেলী
ভোরের গায়েই মিলিয়ে যেত—
হাতে পেতাম
ফুটন্ত সকাল।
তখন আমি
কোলটি ঘেঁসে বসতাম তোমার
হাসি হাসি মুখটি দেখে।
মা তোমাকে মনে পড়ে।

ছেলে বেলার দুরন্তপনা
ডেকে আনতো হাজার বিপদ
তোমার তরে—
তুমি কত কষ্ট পেতে
অকারণে,
সামাল দিতে।
মা তোমাকে মনে পড়ে।

পরিবেশের টুঁটি চেপে
বিপথকে ধমকে দিলে
নিজের জ্ঞানের আলো দিয়ে
তুমি আমায় পথ দেখালে

মেঠো পথ থেকে
তুলে আনলে রাজপথে
কুঁড়ে ঘরের হাতনে থেকে
অট্টালিকার অনুপম অলিন্দে।
মা তোমাকে মনে পড়ে।

তারপর—
আমি যখন এলাম চলে
অনেক দূরে
তোমায় ফেলে,
মনটা তোমার থাকতো পড়ে
আমার কাছে দিনে রাতে,
তুলসী তলায়
বসতে গিয়ে
পথের দিকে চোখটি রেখে
শনিবারের বিকেল হ'লে।
মা তোমাকে মনে পড়ে।

মধ্যিখানের দিনগুলো সব
সুতোয় গাঁথা আলো ছায়া
পাশ কাটিয়ে হঠাৎ তুমি
চলে গেলে আমায় ফেলে!
জানি না আজ
কেমন করে সত্যি হবে
শেষ কথা যে দিয়ে গেলে
থাকবে তুমি আমার কাছে।
মা তোমাকে মনে পড়ে।

কবিতা / অরবিন্দ চক্রবর্ত্তী

এক সন্তানের প্রার্থনা !

মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে
যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল
পৃথিবীর আলোকে
সে নবজাতকের মুখে উচ্চারিত
প্রথম শব্দ 'মা'

শৈশব পেরিয়ে এল যৌবন
যৌবনেই মৃত্যু তার প্রত্যাশার
জীবন যুদ্ধে পর্যুদস্ত
সে এক পরাজিত সৈনিক

মা ! তুমি ক্ষমা কর তাকে

তোমার প্রত্যাশার রূপায়ন
অসম্পূর্ণ এ জন্মে
যদি ফিরে আসি আবার
পাঞ্জা লড়ব এক হাত
জাগতিক শত্রুর সাথে

তাই প্রার্থনা
আবার তাকে এনো পৃথিবীতে।

শিকার

ছাদের কার্ণিসে একটি ছায়া ঃ
হিংস্র শ্বাপদের ক্রুর দৃষ্টি
শিকারের দিকে নিবদ্ধ ঃ

একটি ইঁদুর
প্রথম জ্ঞান উন্মেষের আনন্দে
আপনাতে বিভোর

সহসা একটি আর্তনাদ

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেহাবশেষ।

এক বিবর্ণ যুবক

প্রত্যাশার সিঁড়িগুলি আকাশচুম্বী হতে হতে
ক্রমশ অপসৃয়মান
জীবনের বিবর্ণ ভূগোলে

কি লাভ বল্গাহীন হৃদয়কে শুধু বেঁধে রেখে
নিয়মের যাঁতাকলে

এবার তাকে যেতে দাও নিজস্ব গতিপথে
তেজী ঘোড়ায় সওয়ার উদ্দীপ্ত যুবক যেমন
বাঁধা-বন্ধনহীন ঃ কলম্বাসের মত
মহান কোনও আবিষ্কারকের ভূমিকায়
অভিষেক হোক তার।

স্মৃতি থেকে

আমাদেরও সময় ছিল
যখন রঙীন চশমা চোখে
পৃথিবীকে মনে হত
রঙীন রঙীন

আমাদেরও সুখ ছিল, স্বপ্ন ছিল ঃ
একটুকু বাসা ছিল,
হাতে হাত দিয়ে
ভালবাসার কথা বলা,
নির্জন নিভৃতে
প্রেমিকার মুখোমুখি বসে থাকা—
এ সবই ছিল

সময় নিষ্ঠুর ঃ
যৌবনের সূর্য্য একদিন ডুবে গেল
নির্বোধ আমি
সে সূর্য্যে স্নান করে
সূর্য্যস্নাত হতে পারিনি

আজ তাই রোমন্থনের পালা।

একটি স্কেচ

অসহ্য যন্ত্রণায় কঁকড়ে ওঠে একটা মানুষ

সে চেয়েছিল
নতুন কিছু করতে
গতানুগতিকতার ঊর্দ্ধ্বে

একদিন সে হারিয়ে গেল জনারণ্যে

লাসকাটা ঘরে এক মুদ্দোফরাস
আবিষ্কার করল তাকে
একটা গলিত শব

উন্মত্ত হিংসার শিকার।

অপার বিস্ময়ে

দু-চোখে একরাশ স্বপ্নের বিস্ময় নিয়ে
সে নারী চেয়েছিল তার দয়িতের দিকে
সমর্পণের আর্তি তার দেহবল্লরীর প্রতি খাঁজে

উত্তুঙ্গ হিমালয় ছাপিয়ে ওঠে তার বিস্ময়
যখন সে দয়িত সহসা প্রত্যাখ্যানে
তার নারীত্বের দাবীকে ছুড়ে ফেলে দেয়
আবর্জনার অন্ধকারে

ঘৃণায় কুঁকড়ে ওঠে তার সর্ব্বদেহ
অঙ্গুলি হেলনে সে শুধু বলে
'তুমি এক কাপুরুষ'

তারপর সেই নারী ঋজু পায়ে হেঁটে যায়
নিঃসীম অরণ্যের দিকে।

আর যুদ্ধ নয়

বহু যুদ্ধের শরিক আমরা
অতীত থেকে আজ বর্ত্তমানে
ঘুরে ফিরে সেই এক সুর
সব যুদ্ধের একই মানে

যুদ্ধ মানেই মৃত্যু-ক্ষতি-ভয়
যুদ্ধ মানেই পথে পথে শিশু নিরাশ্রয়
যুদ্ধের ত্রাস আজ প্রতি ঘরে ঘরে
গ্রাম-গঞ্জ-শহর ও নগরে

তাই হে বন্ধু ! যুদ্ধ আর নয়
এবার এসেছে শান্তি ফেরার সময়।

রবীন্দ্রনাথকে

পঁচিশে বৈশাখের কোনও এক শুভ প্রভাতে
জন্মেছিলে তুমি এই সুন্দর পৃথিবীতে
তোমার উপস্থিতির উজ্জ্বল স্বাক্ষরে
জীবনের প্রতি শব্দ গান হয়ে ঝরে।

ডাস্টবিনে অজাতশত্রু

এক নারী তার অবাঞ্ছিত সন্তানের ভার
লাঘব করে গেছে ডাস্টবিনে। সে অজাতক,
স্বাভাবিক জন্ম হলে পর,
টাটা-বিড়লা নয়, হয়ত হরিপদ কেরানী হয়ে
নিদেনপক্ষে কোনও মহিয়সী টেরিজার স্নেহস্পর্শে
মানুষের ভীড়ে মিশে যেত
নাই বা থাক তার পিতৃপরিচয়ের গৌরব।

হয়ত সে নারী পরম সতী সেজে
কণ্ঠলগ্ন কোনও পতির ঃ
পরম সুখে অতিবাহিত তার দিন
নয়ত বা গ্রহের ফেরে
ঘেয়ো বেশ্যা হয়ে
এঁদো গলির আধ-অন্ধকারে
ল্যাম্প হাতে খদ্দেরের প্রতীক্ষায় রত
তার অন্তর-নিভৃত কোণে
বহুদিন মৃত সে অজাতক

পৃথিবীর মাটিতে ভূমিষ্ঠ হবার আগে
যে শিশুর মৃত্যু হল অন্ধকারে
তার জন্মদাত্রীর হাতে

সে শিশুর কান্না আজও শুনি।

বসুন্ধরা সম্মেলন

ধিতান ধিতান ধিতা বলতে পারেন কি তা ?
কত্তাবাবু সায় দিয়েছেন কাটতে যাবেন ফিতা !
ব্রাজিল দেশের মধ্যমণি রিওডিজেনিরো,
দূষণ-মুক্তির শপথ নিয়ে হবেন তিনি হিরো।
তা বলে তার কথায় অন্যে যদি না দেয় সাড়া,
দূষণ-ফুষণ চুলোয় যাক সব হবে ছন্নছাড়া !
ছোটলোক সব যখন তখন জন্মাবে বস্তিতে,
ওদের জ্বালায় থাকবে না কেউ একটুও স্বস্তিতে !
গৌরী সেন দেবে টাকা সে অবশ্য নিশ্চয়,
সুদে-মূলে কিস্তিতে তা শুধবেন মহাশয় !
যুক্তি তক্কো যতই করো যতই যাওনা বেঁকে,
একটি পয়সা মিলবে না তার পুঁজির থলি থেকে !
ফেলো কড়ি মাখো তেল শোননি কি কথা ?
ঘাতক আমি চেঁচিও নাতো ধরে গেলো মাথা !

ইনজিরি খোকা

কিন্ডার গার্টেন পড়ে খোকা ব্রেনভিটা হাতে,
কথায় কথায় ইংরেজি লিও-গাড়ি সাথে।
ফান-স্কুল ভিডিও-গেম কত কি তার ঠোঁটে,
কপিল দেবের মারের মতন দিগ্বিদিক ছোটে।
বাপকে বলে ড্যাডি আর মাকে বলে মামি,
ফি-বছর ফারাণ্টু হয় তো জানে অন্তর্যামী।
পৌঁছে গেল মামাবাড়ি অজপাড়া সে গ্রাম,
মামার ছেলে মাসীর মেয়ে তাই দেখে আটখান।
নেংটিপরা ছোটলোক সব যেন আদিবাসী,
চলন-বলন দেখলে তাদের মুখে আসে হাসি।

ট্রামে-বাসে ট্রেনে-প্লেনে সে ফেরে যন্ত্র-তন্ত্র,
কিন্তু কোথা নেইকো হেন ইতর আর অভদ্র।
মামার ছেলের সঙ্গে সেদিন পাড়তে গেল আম,
লাল পিঁপড়ের কামড়ে তার ছুটে গেল ঘাম।
ফেরার পথে বাঁশের সাঁকোয় যেমনি দিল পা,
ধপাস করে খালের জলে পড়ল ধমাস ধা।
বহু কষ্টে টেনে তাকে তুলল গুড়ির ধাপে,
অশ্রাব্য বুলিতে তার পালায় ভূতের বাপে।
পরদিন ইনজিরি খোকা ফিরে যায় কলকাতা,
হাফ ছেড়ে বাঁচল সেথা গ্রাম্য রসিকতা।

চুণী কোটালের মৃত্যু

চুণী, যা রে চুণী, যা রে তুই দূর বনে ;
সাপ-খোপ আর কাঁচা মাংস তুই খাস জ্ঞাতি সনে !
আয়রে চুণী, আয়রে চুণী আয় মারে এই কোলে ;
লেখাপড়া শিখে তবু ঠাঁই নেই লোধা বোলে !
যা রে চুণী, যা রে চুণী জংলী মেয়ের জাত ;
কোন সাহসে শেলেট নিয়ে রাখিস হেথা পাত !
আয় রে চুণী, আয় রে চুণী, আয় তোরা সকলে ;
মাদল সাথে মহুয়া নাচ ধিতান ধিতান বোলে।
যা রে চুণী, যা রে চুণী, আলকাতরা রমণী ;
থাকবি যদি থাক না হেথা হয়ে চাকরাণী !

আয় রে চুণী, আয় রে চুণী বুকের মাণিক ধন ;
তোকে নিয়ে হেথা মোদের কত আয়োজন !
যা রে চুণী, যা রে চুণী, এ কম্ম তোর নয় ;
তপশিলী শিক্ষা নয় তোর ভদ্র পরিচয়।
আয় রে চুণী, আয় রে চুণী, আয়রে মোদের ঘরে,
ঘরের মেয়ে ঘরে থাক তুই যাসনে পরের দোরে ॥

কবি-পরিচিতি

বার্ণিক রায়—জন্ম (৩রা আশ্বিন, ১৩৪২) ঢাকা জেলার সদর কলাকোপা গ্রাম। সারাটা জীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কাজে রত। কিংবদন্তী 'লা পায়েজি' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। বহু ভাষাবিদ্, কবি, নাট্যকার, সাহিত্য-সমালোচক বার্ণিক রায় বাংলা সাহিত্যে একটি পরিচিত নাম। জীবনের বহু ঘাত প্রতিঘাতে পরীক্ষিত তিনি বই লিখেছেন প্রায় পঞ্চাশটি। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য "হবাগ্‌নের ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ('৬৩), সময়ের ভিড় ('৬৪), আনন্দের মর্মরিত অন্ধকার ('৬৯), টগান্‌বির উর্দু কবিতা ('৭০), এলিঅটের পোড়ো জমি ('৭১), নীল দুপুরের ভয় ('৭২), বিষণ্ন বসন্ত ('৭৫), স্যাঁ-জন্ প্যার্সের 'আনাবাস' ('৭৬), প্রতীক-অরণ্য ('৭৬), বেদনার্ত স্রোত ('৮৩), উইলিয়াম ম্যাসনের কবিতা ('৮৫), রবীন্দ্রনাথের নাটকের উৎস ('৮৭), বিদ্যাসাগর সম্পাদিত ('৯০), এলিঅট ও বাংলা সাহিত্য ('৯১), অন্তর্গত রক্ত : জীবনানন্দ ('৯১) ইত্যাদি। সম্প্রতি সুখেন্দু মল্লিক সম্পাদিত 'আধুনিক সাহিত্য এবং বার্ণিক রায়' গ্রন্থে বার্ণিক রায়ের সাহিত্য সাধনা এবং বিশ্ব-সাহিত্য মন্থন করা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার এক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। খুবই দুঃখের কথা এমন একটি বিরল প্রতিভা আজও সরকারী ঔদাসীন্যের শিকার। সম্ভবত বার্ণিক রায়ের বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ও/বা তাঁর 'গিভ দ্য ডেভিল হিজ ডিউ শেয়ার' এই মনোভাব তার একমাত্র কারণ। বার্ণিক রায়ের কাব্যরস সম্যক বুঝতে হলে পাঠকের মানসিক স্তরকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যেতে হবে ; নতুবা তাঁর কাব্য পড়া বৃথা। তাই 'আমার সাহিত্যের কথা' প্রসঙ্গে বার্ণিক রায়ের উক্তি—'রচয়িতা⋯আলোকেই প্রকাশ করতে চায় সূর্যের সাদৃশ্যে⋯সেই রশ্মির সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া কেউ বুঝতে পারে⋯(আবার) অনেকেই পারে না।'

সুনীল পাল—জন্ম (২৩-৪-৩৬) ঢাকা জেলার সদর গোবিন্দপুর গ্রাম। স্নাতক (কলা ও বাণিজ্য)। কেন্দ্র-সরকারী কর্মচারী। 'সুন্দর বনের বাঘ' এই ছদ্মনামে 'রুদ্রলোক' পত্রিকার সম্পাদক। প্রকাশিত গ্রন্থ : চতুর্দশপদী

কাব্য-চরিত ('৭৮), মানস ('৮৪); সূক্তিমালা—দ্যুতি ('৮৬); ছড়া-গাথা—টুকিটাকি ('৮৮); ছোটগল্প—অসুর-নাশিনী ('৯২) এবং মৃত গোয়েন্দার স্বপ্ন ('৯৩) (যন্ত্রস্থ); উপন্যাস—মহাজাতি ১ম খণ্ড (যন্ত্রস্থ)। ছন্দম প্রকাশিত 'প্রতিসর্গ' ছোট গল্প সংকলনে তাঁর গল্প রয়েছে। তাছাড়া প্রাঙ্মুখ ছদ্মনামে প্রবন্ধ / নিবন্ধ লেখক।

শিবেন বিশ্বাস—জন্ম (২০-১০-'৪০) খুলনা জেলার তেরখাদা থানার নলিয়ার চর। কেন্দ্র-সরকারী কর্মচারী। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ—জাগরনী ও জয় বাংলার কাব্য। এছাড়া দেশব্রতী ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর কবিতা বেরিয়েছে।

অর্ঘ্যনারায়ণ বসু—জন্ম (৭-৪-৫৬) বর্ধমান শহরে। কেন্দ্র-সরকারী কর্মচারী। স্নাতক (কলা ও বাণিজ্য)। প্রথম কাব্যগ্রন্থ—যুদ্ধ ঘোষণার দিন (যন্ত্রস্থ)। তাছাড়া বসুমতী, গণশক্তি, বর্তমান দৈনিক পত্রিকা এবং কৃত্তিবাস, এক্ষণ, কবিতা, উত্তরসূরী, শব্দযাত্রা ইত্যাদি ক্ষুদ্র পত্রিকায় তাঁর অনেক কবিতা বেরিয়েছে।

বিমল মৈত্র—জন্ম (১০-৪-৩৫) মহানগরী কলকাতার বুকে। কেন্দ্র-সরকারী কর্মচারী। সুরেন্দ্রনাথ কলেজে থাকা অবস্থায় কবিতায় হাতেখড়ি। দুর্বার পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক। সাহিত্যম, সাহিত্য সংগ্রহ, ধায় শত পায়, একটি মাণিক জ্বালো, ছড়ায় রবি ঠাকুর, ঈশ্বর বন্দনা, মাদার টেরিজা ইত্যাদি সংকলনে তাঁর লেখা স্থান পেয়েছে। তাছাড়া যুগান্তর, বসুমতী, বর্তমান, ওভারল্যান্ড, সত্যযুগ, কলকাতা ইত্যাদি দৈনিক পত্রিকা এবং কিশোর বাংলা, ধনধান্য, কলেজ স্ট্রীট, মৌচাক, ঐকতান, রুদ্রলোক ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরিয়েছে।

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়—জন্ম (১৮-১১-৩৭) উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নাটাগড়, সোদপুর। বাংলা ভাষায় এম. এ.। কেন্দ-সরকারী কর্মচারী। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ—হাঁটা এ জীবন ('৬৭)। এছাড়া ভারতবর্ষ, পল্লীগ্রাম, সমন্বয়, রুদ্রলোক, জাগর, দুর্বার, পলিমাটি ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর অনেক কবিতা / গল্প বেরিয়েছে।

প্রবীর জানা—জন্ম (২৭-৭-৫১) মেদিনীপুর জেলার সোনাচড়া গ্রাম। কেন্দ্র-সরকারী কর্মচারী। রাজনীতিতে এম. এ.। প্রকাশিত গ্রন্থ—বিদ্রোহী বীরেন্দ্রনাথ, বিপ্লবী বীর বীরেন্দ্রনাথ, দেশপ্রাণের আলোকে বনবিহারী দাস, দিগন্তে রঙের ছোঁয়া (উপন্যাস)। তাছাড়া যুগান্তর, বসুমতী, ওভারল্যান্ড, রুদ্রলোক, দুর্বার প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখা বেরিয়েছে।

অমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—জন্ম (১২-৮-'১৭) চট্টগ্রাম জেলার খিতাবচর গ্রাম। বাংলায় এম এ.। অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্র-সরকারী কর্মচারী। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ—আভাষ, সূর্য্য, পরিচয়, রবি-দ্যুতি, কালের মানুষ।

সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্ম (১-৪-৬৭) হাওড়া জেলার বেতড়। কেন্দ্র-সরকারী কর্মচারী। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সঙ্গীত)। প্রকাশিত নাটক—কিশোরের ইশারায়। তাছাড়া যুগান্তর, ওভারল্যান্ড, কবি-সম্ভার, রুদ্রলোক, দুর্বার প্রভৃতি কাগজে তাঁর লেখা বেরিয়েছে।

ধনঞ্জয় সিংহ—জন্ম (১৯৫৩) হুগলী জেলার শ্রীরামপুর শহরতলী। ব্যাঙ্ক কর্মচারী। সম্পাদিত কবিতা সংকলন 'কবি-বাসর'। এছাড়া সমাচার, পল্লীকথা, ঐকতান, যোগাযোগ, সত্যলোক, সন্দীপন, রুদ্রলোক, কচিপাতা ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর অনেক কবিতা বেরিয়েছে।

বিভাস চক্রবর্ত্তী—কেন্দ্র-সরকারী কর্মচারী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। বসুমতী, গণশক্তি, সত্যযুগ ইত্যাদি দৈনিক পত্রিকায় এবং রুদ্রলোক, দুর্বার, কবিবাসর প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরিয়েছে।

প্রকাশ সেনগুপ্ত—জন্ম (২৬-৬-৪১) যশোর জেলার ঝিনেদায়। কেন্দ্র-সরকারী কর্মচারী। বাংলায় এম. এ.। 'চরৈবেতী' পত্রিকার সম্পাদক এবং যৌথভাবে সম্পাদনা করেছেন 'মাদার টেরিজাকে নিবেদিত' কাব্যগ্রন্থ। তাঁর

লেখা আজকাল, ওভারল্যাণ্ড, সাহিত্যতীর্থ (দিল্লী), শঙ্খ (রুরকেল্লা), ঝিনুক (ত্রিপুরা), পদ্মাগঙ্গা, রুদ্রলোক প্রভৃতি পত্রিকায় বেরিয়েছে। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাছাড়া প্রকাশবাবু ভ্রমণ-পিপাসু এবং তারই ফসল 'পথ চলি আনন্দে'।

আলো সেন—জন্ম (৫-৮-৬৪) জলপাইগুড়ি জেলার হান্টাপাড়া গ্রাম। উচ্চ-মাধ্যমিক। ঘর-সংসাররত অবস্থায়ও সাহিত্য সেবায় ব্রতী। ব্রতীদীপ, আলোচনা প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কবিতা বেরিয়েছে।

রাজেশ দাশ- জন্ম (২-১১-৩১) উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট শহরতলিতে। অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্র-সরকারী কর্মচারী। এম· কম· ; এল-এল বি। 'চলাচল' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। তাছাড়া তাঁর লেখা কবিতা ও গল্প স্বাস্তিক, প্রবাহ ইত্যাদি পত্রিকায় বেরিয়েছে।

অরবিন্দ চক্রবর্তী—জন্ম (৭-১১-৩৬) রংপুর জেলার মুলাটোল গ্রাম। রাজসাহী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতক। সরকারী কর্মচারী। কিশোর ভারতী, শুকতারা, সন্দেশ, মৌচাক, নবকল্লোল, ওভারল্যাণ্ড ইত্যাদি পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'অতলান্তিক' পত্রিকায় তাঁর লেখা স্থান পেয়েছে।

সোমা পাল—জন্ম (১-১-৭১) উত্তর ২৪ পরগণার নিমতা গ্রামে। ছাত্রাবস্থায় লেখালেখিতে হাতেখড়ি। রুদ্রলোক পত্রিকায় কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে।